সা–দ

৩৮

নামকরণ

সূরা শুরুর হরফ 'সা–দ'কে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হবার সময়-কাল

যেমন সামনের দিকে বলা হবে, কোন কোন হাদীস অনুযায়ী দেখা যায়, এ সূরাটি এমন এক সময় নাযিল হয়েছিল যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা মুআয্যমায় প্রকাশ্যে দাওয়াত দেয়া শুরু করেছিলেন এবং এ কারণে কুরাইশ সরদারদের মধ্যে হৈ চৈ শুরু হয়ে গিয়েছিল। এ হিসেবে প্রায় নবুওয়াতের চতুর্থ বছরটি এর নাযিল হবার সময় হিসেবে গণ্য হয়। অন্যান্য হাদীসে একে হযরত উমরের (রা) ঈমান আনার পরের ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করা হয়। আর হযরত উমর হাবৃশায় হিজরাত অনুষ্ঠিত হবার পর ঈমান আনেন, একথা সবার জানা। আর এক ধরনের হাদীস থেকে জানা যায়, আবু তালেবের শেষ রোগগ্রস্ততার সময় যে ঘটনা ঘটে তারই ভিত্তিতে এ সূরা নাযিল হয়। একে যদি সঠিক বলে মেনে নেয়া হয়, তাহলে এর নাযিলের সময় হিসেবে ধরতে হয় নবুওয়াতের দশম বা দ্বাদশ বছরকে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

ইমাম আহমাদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে জারীর, ইবনে আবী শাইবাহ, ইবনে আবী হাতেম ও মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ যেসব হাদীস উদ্ধৃত করেছেন সেগুলোর সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে ঃ যখন আবু তালেব রোগাক্রান্ত হলেন এবং কুরাইশ সরদাররা অনুভব করলো, এবার তাঁর শেষ সময় এসে গেছে, তখন তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলো, বৃদ্ধের কাছে গিয়ে তাঁর সাথে কথা বলা উচিত। তিনি আমাদের ও তাঁর ভাতিজার ঝগড়া মিটিয়ে দিয়ে গেলে ভালো। নয়তো এমনও হতে পারে, তাঁর ইন্তিকাল হয়ে যাবে এবং আমরা তাঁর পরে মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে কোন কঠোর ব্যবহার করবো আর আরবের লোকেরা এ বলে আমাদের খোঁটা দেবে যে, যতদিন বৃদ্ধ লোকটি জীবিত ছিলেন ততদিন এরা তাঁর মর্যাদা রক্ষা করে চলেছে, এখন তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাতিজার গায়ে হাত দিয়েছে। একথায় সবাই একমত হয়। ফলে প্রায় ২৫ জন কুরাইশ সরদার আবু তালেবের কাছে হাজির হয়। এদের অন্যতম ছিল আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান, উমাইয়াহ ইবনে খাল্ফ, আস ইবনে ওয়ায়েল, আস্ওয়াদ ইবনুল

মুত্তালিব, উকবাহ ইবনে আবী মু'আইত, উতবাহ ও শাইবাহ। তারা যথারীতি প্রথমে আবু তালেবের কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে নিজেদের অভিযোগ পেশ করে তারপর বলে, আমরা আপনার কাছে একটি ইনসাফপূর্ণ আপোষের কথা পেশ করতে এসেছি। আপনার ভাতিজা আমাদেরকে আমাদের ধর্মের ওপর ছেড়ে দিক আমরাও তাকে তার ধর্মের ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। সে যে মাবুদের ইবাদাত করতে চায় করুক, তার বিরুদ্ধে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু সে আমাদের মাবুদদের নিন্দা করবে না এবং আমরা যাতে আমাদের মাবুদদেরকে ত্যাগ করি সে প্রচেষ্টা চালাবে না। এ শর্তের ভিত্তিতে আপনি তার সাথে আমাদের সন্ধি করিয়ে দিন। আবু তালেব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডাকলেন। তাঁকে বললেন, ভাতিজা! এই যে তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আমার কাছে এসেছে। তাদের আকাংখা, তুমি একটি ইনসাফপূর্ণ আপোষের ভিত্তিতে তাদের সাথে একমত হয়ে যাবে। এভাবে তোমার সাথে তাদের বিবাদ খতম হয়ে যাবে। তারপর কুরাইশ সরদাররা তাঁকে যে কথাগুলো বলেছিল সেগুলো তিনি তাঁকে শুনিয়ে দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন ঃ "চাচাজান! আমি তো তাদের সামনে এমন একটি কালেমা পেশ করছি তাকে যদি তারা মেনে নেয় তাহলে সমগ্র আরব জাতি তাদের হুকুমের অনুগত হয়ে যাবে এবং অনারবরা তাদেরকে কর দিতে থাকবে।"[১] একথা শুনে প্রথমে তো তারা হতভম্ব হয়ে গেল। তারা বুঝতে পারছিল না এমন লাভজনক কথার প্রতিবাদ করবে কি বলে। কাজেই নিজেদের বক্তব্য কিছুটা গুছিয়ে

---

১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তিটি বিভিন্ন বর্ণনাকারী বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। একটি হাদীসে বলা হয়েছে তিনি বলেছেন ঃ

اريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدى اليهم بها العجم الجزية

(অর্থাৎ আমি তাদের সামনে এমন একটি কালেমা পেশ করছি তা পাঠ করলে তারা সমগ্র আরব জয় করে ফেলবে এবং অনারবরা তাদেরকে জিযিয়া দেবে।) অন্য একটি হাদীসের শব্দাবলী হচ্ছে ঃ

ادعوهم الى ان يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها ارعجم

(অর্থাৎ আমি তাদেরকে এমন একটি কালেমা পড়ার ডাক দিচ্ছি যা পাঠ করলে তারা সমগ্র আরব জয় করবে এবং অনারবরা তাদের শাসনাধীন হবে।) অন্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি আবু তালেবের পরিবর্তে কুরাইশ সরদারদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم

অন্য একটি হাদীসের শব্দাবলী হচ্ছে ঃ

ارأيتم ان اعطيتكم كلمة تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم

বর্ণনাগুলোর এ শাব্দিক পার্থক্য সত্ত্বেও বক্তব্য সবগুলোর একই। অর্থাৎ নবী করীম (সা) তাদেরকে বলেন, যদি আমি এমন একটি কালেমা তোমাদের সামনে পেশ করি যা গ্রহণ করে তোমরা আরব ও আজমের মালিক হয়ে যাবে তাহলে বলো, এটি বেশী ভালো, না তোমরা ইনসাফের নামে যে কথাটি আমার সামনে পেশ করছো সেটি বেশী ভালো? তোমরা এ কালেমাটি মেনে নেবে অথবা যে অবস্থার মধ্যে তোমরা এখন পড়ে রয়েছো তার মধ্যেই তোমাদের পড়ে থাকতে দেবো এবং নিজের জায়গায় বসে আমি নিজের আল্লাহর ইবাদাত করতে থাকবো—কোন্‌টির মধ্যে তোমাদের কল্যাণ রয়েছে?

নিয়ে তারা বলতে শুরু করলো, তুমি একটি কালেমা বলছো কেন আমরা তো এমন দশটি কালেমা বলতে রাজি কিন্তু সেই কালেমাটি কি তাতো একবার বলো। তিনি বললেন ঃ লা–ইলা–হা ইল্লাল্লাহু। একথা শুনেই তারা সবাই একসাথে উঠে দাঁড়ালো এবং সে কথাগুলো বলতে বলতে চলে গেলো যা আল্লাহ এ সূরার শুরুতে উদ্ধৃত করেছেন।

ওপরে যেভাবে উল্লিখিত হয়েছে ইবনে সা'দ তাবকাতে ঠিক তেমনিভাবেই সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী এটা আবু তালেবের মৃত্যুকালীন রোগগ্রস্ততার সময়কার ঘটনা নয় বরং এটা এমন এক সময়ের ঘটনা যখন নবী করীম (সা) তাঁর সাধারণ দাওয়াতের কাজ শুরু করেছিলেন এবং মক্কায় অনবরত খবর ছড়িয়ে পড়ছিল যে, আজ অমুক ব্যক্তি মুসলমান হয়ে গেছে এবং কাল অমুক ব্যক্তি। সে সময় কুরাইশ সরদাররা একের পর এক কয়েকটি প্রতিনিধি দল নিয়ে আবু তালেবের কাছে পৌঁছেছিল। তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ প্রচার কাজ থেকে বিরত রাখতে চাচ্ছিল। এ প্রতিনিধি দলগুলোরই একটির সাথে উল্লিখিত আলাপ আলোচনা হয়।

যামাখ্শারী, রাযী, নিশাপুরী ও অন্যান্য কতিপয় মুফাস্সির বলেন, এ প্রতিনিধি দল আবু তালেবের কাছে গিয়েছিল এমন এক সময় যখন হযরত উমরের (রা) ঈমান আনার ফলে কুরাইশ সরদাররা হকচকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হাদীসের কোন কিতাবে এর সমর্থন পাওয়া যায়নি এবং মুফাস্সিরগণও তাঁদের উৎসসমূহের বরাত দেননি। তবুও যদি এটা সঠিক হয়ে থাকে তাহলে একথা বোধগম্য। কারণ কাফের কুরাইশরা প্রথমেই এ দৃশ্য দেখে ভীত হয়ে পড়েছিল যে, ইসলামের দাওয়াত নিয়ে তাদের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্তি উঠেছেন যিনি নিজের পারিবারিক আভিজাত্য, নিষ্কলংক চরিত্র, বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা ও বিচার–বিবেচনার দিক দিয়ে সমস্ত জাতির মধ্যে অদ্বিতীয়। তারপর আবু বকরের মতো লোক তাঁর ডানহাত, যাকে মক্কা ও তার আশপাশের এলাকার প্রত্যেকটি শিশুও একজন অত্যন্ত ভদ্র, বিবেচক, সত্যবাদী ও পবিত্র–পরিচ্ছন্ন মানুষ হিসেবে জানে। এখন যখন তারা দেখলো, উমর ইবনে খাত্তাবের মতো অসম সাহসী ও দৃঢ় সংকল্প ব্যক্তিও এ দু'জনের সাথে মিলিত হয়েছেন তখন নিশ্চিতভাবেই তারা অনুভব করে থাকবে যে, বিপদ সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

ওপরে যে মজলিসের উল্লেখ করা হয়েছে তার ওপর মন্তব্য দিয়েই সূরার সূচনা করা হয়েছে। কাফের ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যকার আলাপ–আলোচনার ভিত্তিতে আল্লাহ বলেছেন, তাদের অস্বীকারের আসল কারণ ইসলামী দাওয়াতের কোন ত্রুটি নয় বরং এর আসল কারণ হচ্ছে, তাদের আত্মম্ভরিতা, হিংসা ও একগুঁয়েমীর ওপর অবিচল থাকা। নিজেদের জ্ঞাতি–বেরাদরির এক ব্যক্তিকে আল্লাহর নবী বলে মেনে নিয়ে তাঁর আনুগত্য করতে তারা প্রস্তুত নয়। তাদের পূর্বপুরুষদেরকে তারা যেমন জাহেলী ধ্যান–ধারণায় বিশ্বাসী পেয়েছে ঠিক তেমনি ধারণা–কল্পনার ওপর তারা নিজেরাও অবিচল থাকতে চায় আর যখন এ জাহেলিয়াতের আবরণ ছিন্ন করে এক ব্যক্তি তাদের সামনে আসল সত্য উপস্থাপন করেন তখন তারা উৎকর্ণ হয় এবং তাঁর কথাকে অদ্ভুত,

অভিনব ও অসম্ভব গণ্য করে। তাদের মতে, তাওহীদ ও আখেরাতের ধারণা কেবল যে, অগ্রহণযোগ্য তাই নয় বরং এটা এমন একটা ধারণা যা নিয়ে কেবল ঠাট্টা তামাশাই করা যেতে পারে।

এরপর আল্লাহ সূরার শুরুর দিকে এবং শেষ বাক্যগুলোতেও কাফেরদেরকে সুস্পষ্টভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, আজ তোমরা যে ব্যক্তিকে বিদ্রূপ করছো এবং যার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে জোরালো অস্বীকৃতি জানাচ্ছো, খুব শিগগির সে–ই বিজয়ী হবে এবং সে সময়ও দূরে নয় যখন যে মক্কা শহরে তোমরা তাঁকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছো, এ শহরেই তোমরা তাঁর সামনে অবনত মস্তক হবে।

এরপর একের পর এক ৯ জন পয়গম্বরের কথা বলা হয়েছে। এঁদের মধ্যে হযরত দাউদ (আ) ও হযরত সুলাইমানের (আ) কাহিনী বেশী বিস্তারিত। এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ শ্রোতাদেরকে একথা হৃদয়ংগম করিয়েছেন যে, ইনসাফের আইন পুরোপুরি ব্যক্তি নিরপেক্ষ। মানুষের সঠিক মনোভাব ও কর্মনীতিই তার কাছে গ্রহণীয়। অন্যায় কথা, যে–ই বলুক না কেন, তিনি তাকে পাকড়াও করেন। ভুলের ওপর যারা অবিচল থাকার চেষ্টা করে না বরং জানার সাথে সাথেই তাওবা করে এবং দুনিয়ায় আখেরাতের জবাবদিহির কথা মনে রেখে জীবন যাপন করে তারাই তার কাছে পছন্দনীয়।

এরপর অনুগত ও বিদ্রোহী বান্দারা আখেরাতের জীবনে যে পরিণামের সম্মুখীন হবে তার চিত্র অংকন করা হয়েছে এবং এ প্রসংগে কাফেরদেরকে বিশেষ করে দু'টি কথা বলা হয়েছে। এক, আজ যেসব সরদার ও ধর্মীয় নেতাদের পেছনে মূর্খ লোকেরা অন্ধের মতো ভ্রষ্টতার দিকে ছুটে চলছে আগামীতে তারাই জাহান্নামে পৌঁছে যাবে তাদের অনুসারীদের আগে এবং তারা উভয়দল পরস্পরকে দোষারোপ করতে থাকবে। দুই, আজ যেসব মু'মিনকে এরা লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত মনে করছে আগামীতে এরা অবাক চোখে তাকিয়ে দেখবে জাহান্নামে কোথাও তাদের নাম নিশানাও নেই এবং এরা নিজেরাই তার আযাবে পাকড়াও হয়েছে।

সবশেষে আদম (আ) ও ইবলিসের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কাফের কুরাইশদেরকে একথা বলা যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে নত হবার পথে যে অহংকার তোমাদের বাধা দিচ্ছে সে একই অহংকার আদমের সামনে নত হতে ইবলিসকে বাধা দিয়েছিল। আল্লাহ আদমকে যে মর্যাদা দিয়েছিলেন ইবলিস তাতে ঈর্যান্বিত হয়েছিল এবং আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে লানতের ভাগী হয়েছিল। অনুরূপভাবে আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে মর্যাদা দিয়েছেন তাতে তোমাদের হিংসা হচ্ছে এবং আল্লাহ যাঁকে রসূল নিযুক্ত করেছেন তাঁর আনুগত্য করতে প্রস্তুত হচ্ছো না। তাই ইবলিসের যে পরিণতি হবে সে একই পরিণতি হবে তোমাদেরও।

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ ۝١ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ ۝٢
كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ۝٣

সা–দ।[১] উপদেশপূর্ণ[২] কুরআনের শপথ। বরং এরাই, যারা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, প্রচণ্ড অহংকার ও জিদে লিপ্ত হয়েছে।[৩] এদের পূর্বে আমি এমনি আরো কত জাতিকে ধ্বংস করেছি (এবং যখন তাদের সর্বনাশ এসে গেছে) তারা চিৎকার করে উঠেছে, কিন্তু সেটি রক্ষা পাওয়ার সময় নয়।

১. সমস্ত "মুকাত্তা'আত" হরফের মতো 'সা–দ'–এর অর্থ চিহ্নিত করা যদিও কঠিন তবুও ইবনে আব্বাস (রা) ও যাহ্হাকের এ উক্তিও কিছুটা মনে দাগ কাটে যে, এর অর্থ হচ্ছে, صادق فى قوله অথবা صدق محمد অর্থাৎ "মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যবাদী। তিনি যা বলছেন সবই সত্য।"

২. মূল শব্দ হচ্ছে ذى الذكر এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, ذى شرف অর্থাৎ জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মহাপাণ্ডিত্যপূর্ণ। দুই, ذى التذكير অর্থাৎ উপদেশে পরিপূর্ণ। অর্থাৎ ভুলে যাওয়া শিক্ষা আবার স্মরণ করিয়ে দেয় এবং গাফলতি থেকে সজাগ করে দেয়।

৩. যদি ইবনে আব্বাস ও দ্বাহ্হাক বর্ণিত সা–দ–এর ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয়, তাহলে এ বাক্যের অর্থ হবে, "জ্ঞানপূর্ণ বা উপদেশমালায় পরিপূর্ণ কুরআনের কসম, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য কথা উপস্থাপন করছেন। কিন্তু যারা অস্বীকার করার ওপর অবিচল রয়েছে তারা আসলে জিদ ও অহংকারে লিপ্ত হয়েছে।" আর যদি সা–দকে এমন সব হরফে মুকাত্তা'আতের অন্তরভুক্ত করা হয় যাদের অর্থ নির্ধারণ করা যেতে পারে না তাহলে এখানে বলতে হবে কসমের জবাব উহ্য রয়েছে যা "বরং" তার পরবর্তী বাক্যাংশ নিজেই একথা প্রকাশ করছে। অর্থাৎ এ অবস্থায় সম্পূর্ণ বাক্যটি এভাবে হবে, "এ অস্বীকারকারীদের অস্বীকার করার কারণ এ নয় যে, তাদের সামনে যে দীন পেশ করা হচ্ছে তার মধ্যে কোন ত্রুটি আছে অথবা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সামনে সত্য প্রকাশে কোন ত্রুটি করেছেন, বরং এর কারণ হচ্ছে কেবলমাত্র তাদের মিথ্যা অহংকার, তাদের জাহেলী আত্মম্ভরিতা এবং তাদের হঠকারিতা, আর উপদেশে পরিপূর্ণ এ কুরআন এ ব্যাপারে সাক্ষী, যা দেখে প্রত্যেক নিরপেক্ষ ব্যক্তি স্বীকার করবে যে, এর মধ্যে উপদেশ দেবার দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করা হয়েছে।"

وَعَجِبُوٓا أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ ۖ وَقَالَ الْكٰفِرُونَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ④
أَجَعَلَ الْأٰلِهَةَ إِلٰهًا وَّاحِدًا ۖ إِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ ⑤ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ
مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلٰىٓ اٰلِهَتِكُمْ ۖ إِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ يُّرَادُ ⑥
مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِى الْمِلَّةِ الْأٰخِرَةِ ۚ إِنْ هٰذَآ إِلَّا اخْتِلَاقٌ ⑦ ءَأُنزِلَ عَلَيْهِ
الذِّكْرُ مِنۢ بَيْنِنَا ۭ بَلْ هُمْ فِى شَكٍّ مِّن ذِكْرِى ۚ بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ ⑧

এরা একথা শুনে বড়ই অবাক হয়েছে যে, এদের নিজেদের মধ্য থেকেই একজন ভীতি প্রদর্শনকারী এসে গেছে।[৪] অস্বীকারকারীরা বলতে থাকে, "এ হচ্ছে যাদুকর,[৫] বড়ই মিথ্যুক, সকল খোদার বদলে সেকি মাত্র একজনকেই খোদা বানিয়ে নিয়েছে? এতো বড় বিস্ময়কর কথা!" আর জাতির সরদাররা একথা বলতে বলতে বের হয়ে গেলো,[৬] "চলো, অবিচল থাকো নিজেদের উপাস্যদের উপাসনায়। একথা তো[৭] ভিন্নতর উদ্দেশ্যেই বলা হচ্ছে[৮] নিকট অতীতের মিল্লাতগুলোর মধ্য থেকে কারো কাছ থেকে তো আমরা একথা শুনিনি।[৯] এটি একটি মনগড়া কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের মধ্যে কি মাত্র এ এক ব্যক্তিই থেকে গিয়েছিল যার কাছে আল্লাহর যিক্‌র নাযিল করা হয়েছে?"

আসল কথা হচ্ছে, এরা আমার যিক্‌র-এর ব্যাপারে সন্দেহ করছে[১০] আমার আযাবের স্বাদ পায়নি বলেই এরা এসব করছে।

৪. অর্থাৎ এরা এমনই নির্বোধ যে, যখন এদের নিজেদেরই জাতি, সম্প্রদায় ও গোত্র থেকে একজন জানা-শোনা ভালো লোককে এদেরকে সতর্ক করার জন্য নিযুক্ত করা হয় তখন এ ব্যাপারটি এদের কাছে অদ্ভুত মনে হয়েছে। অথচ মানুষকে সতর্ক করার জন্য যদি আকাশ থেকে কোন ভিন্ন ধরনের প্রাণী পাঠিয়ে দেয়া হতো অথবা তাদের মাঝখানে হঠাৎ যদি বাইর থেকে কোন একজন অপরিচিত ব্যক্তি এসে দাঁড়াতো এবং নিজের নবুওয়াতি চালিয়ে যেতো, তাহলে সেটাই তো অদ্ভুত মনে হবার কথা। সে অবস্থায় তারা নিসন্দেহে বলতে পারতো, আমাদের সাথে অদ্ভুত আচরণ করা হয়েছে। যে মানুষই নয়, সে আমাদের অবস্থা, আবেগ-অনুভূতি ও প্রয়োজনের কথা জানবে কেমন করে? কাজেই সে আমাদের পথের দিশা কেমন করে দেবে? অথবা যে অপরিচিত ব্যক্তি হঠাৎ আমাদের মধ্যে এসে গেছে আমরা কেমন করে তার সত্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা যাচাই করবো এবং কেমন করে জানবো সে নির্ভরযোগ্য কিনা? তার চরিত্র ও কার্যকলাপই বা আমরা দেখলাম কোথায়? কাজেই তাকে নির্ভরযোগ্য বা অনির্ভরযোগ্য মনে করার ফায়সালা করবো কেমন করে?

৫. নবী করীমের (সা) জন্য যাদুকর শব্দটি তারা যে অর্থে ব্যবহার করতো তা হচ্ছে এই যে, তিনি মানুষকে এমন কিছু যাদু করতেন যার ফলে তারা পাগলের মতো তাঁর পেছনে লেগে থাকতো। কোন সম্পর্কচ্ছেদ করার বা কোন প্রকার ক্ষতির মুখোমুখি হবার কোন পরোয়াই তারা করতো না। পিতা পুত্রকে এবং পুত্র পিতাকে ত্যাগ করতো। স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করতো এবং স্বামী স্ত্রী থেকে আলাদা হয়ে যেতো। হিজরাত করার প্রয়োজন দেখা দিলে একেবারে সবকিছু সম্পর্ক ত্যাগ করে স্বদেশভূমি থেকে বের হয়ে পড়তো। কারবার শিকেয় উঠুক এবং সমস্ত জ্ঞাতি-ভাইরা বয়কট করুক—কোনদিকেই দৃকপাত করতো না। কঠিন থেকে কঠিনতর শারীরিক কষ্টও বরদাশত করে নিতো কিন্তু ঐ ব্যক্তির পেছনে চলা থেকে বিরত হতো না। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আম্বিয়া, ৫ টীকা)

৬. যে সরদাররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শুনে আবু তালেবের মজলিস থেকে উঠে গিয়েছিল তাদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

৭. অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একথা যে, কালেমা লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু কে মেনে নাও, তাহলে সমস্ত আরব ও আজম তোমাদের হুকুমের তাবেদার হয়ে যাবে।

৮. তাদের বক্তব্য ছিল, এটা একটা মতলবী কথা বলে মনে হচ্ছে। অর্থাৎ এ উদ্দেশ্যে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে যে, আমরা মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুকুমের তাবেদারী করবো এবং তিনি আমাদের মাথার ওপর নিজে ছড়ি ঘোরাবেন।

৯. অর্থাৎ নিকট অতীতে আমাদের নিজেদের মুরব্বি ও মনীষীরাও অতিক্রান্ত হয়েছেন। ইহুদী ও খৃষ্টানরাও আমাদের দেশে এবং আশপাশের দেশে রয়েছে এবং অগ্নি উপাসকরা তো ইরান-ইরাক ও সমগ্র পূর্ব আরব ভরে আছে। তাদের কেউও আমাদের একথা বলেনি যে, মানুষ একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে মেনে নেবে এবং আর কাউকেও মানবে না। একজন এবং মাত্র একক খোদাকে কেউ যথেষ্ট মনে করতে পারে না। আল্লাহর প্রিয়পাত্রদেরকে তো সবাই মেনে চলছে। তাদের আস্তানায় গিয়ে মাথা ঠেকাচ্ছে। নজরানা ও সিন্নি দিচ্ছে। প্রার্থনা করছে। কোথাও থেকে সন্তান পাওয়া যায়। কোথাও রিযিক পাওয়া যায়। কোন আস্তানায় গিয়ে যা চাইবে তাই পাবে। দুনিয়ার বিরাট অংশ তাদের ক্ষমতা মেনে নিয়েছে। তাদের দরবারসমূহ থেকে প্রার্থীদের প্রার্থনা পূর্ণ ও সংকট নিরসন কিভাবে হয়ে থাকে, তাদের অনুগ্রহ লাভকারীরা তা জানিয়ে দিচ্ছে। এখন এ ব্যক্তির কাছ থেকে আমরা এমন অভিনব কথা শুনছি যা ইতিপূর্বে কোথাও শুনিনি। এ ব্যক্তি বলছে, এদের কারো প্রভুত্বে কোন অংশ নেই এবং সমস্ত প্রভুত্ব একমাত্র এবং একচ্ছত্রভাবে আল্লাহরই জন্য নির্ধারিত।

১০. অন্যকথায় বলা যায়, আল্লাহ বলেন, হে মুহাম্মাদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরা মূলত তোমাকে অস্বীকার করছে না বরং অস্বীকার করছে আমাকে তারাতো পূর্বেও তোমার সত্যবাদিতায় সন্দেহ করেনি। আজ তারা যে এ সন্দেহ করছে এটা আসলে যিক্‌রের কারণে। তাদেরকে উপদেশ দেবার দায়িত্ব যখন আমি তোমার ওপর সোপর্দ করেছি তখন তারা এমন এক ব্যক্তির সত্যবাদিতায় সন্দেহ করতে শুরু করেছে যার

أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ⑨ أَمْ لَهُم مُّلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ⑩ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ ⑪ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ⑫ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لْئَيْكَةِ ۚ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ ⑬ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ⑭

তোমার মহানদাতা ও পরাক্রমশালী পরওয়ারদিগারের রহমতের ভাণ্ডার কি এদের আয়ত্বাধীনে আছে? এরা কি আসমান–যমীন এবং তাদের মাঝখানের সবকিছুর মালিক? বেশ, তাহলে এরা কার্যকারণ জগতের উচ্চতম শিখরসমূহে আরোহণ করে দেখুক।[১১]

বহুদলের মধ্য থেকে এতো ছোট্ট একটি দল, এখানেই এটি পরাজিত হবে।[১২] *এরপূর্বে নূহের সম্প্রদায়, আদ, কীলকধারী ফেরাউন,*[১৩] *সামূদ, লূতের সম্প্রদায় ও আইকাবাসীরা মিথ্যা আরোপ করেছিল। তারা ছিল বিরাট দল। তাদের প্রত্যেকেই রসূলগণকে অস্বীকার করেছে। ফলে তাদের প্রত্যেকের ওপর আমার শাস্তির ফায়সালা কার্যকর হয়েই গেছে।*

সত্যবাদিতার তারা ইতিপূর্বে কসম খেতো। একই বিষয়বস্তু সূরা আল আন'আমের ৩৩ আয়াতেও ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন আল আন'আম, ২১ টীকা)

১১. "এটি হচ্ছে আমাদের মধ্যে কি মাত্র এ এক ব্যক্তিই থেকে গিয়েছিল যার কাছে আল্লাহর যিক্‌র নাযিল করা হয়েছে।" কাফেরদের এ উক্তির জবাব। এর জবাবে আল্লাহ বলছেন ঃ আমি কাকে নবী করবো এবং কাকে করবো না এর ফায়সালা করার দায়িত্ব আমার নিজের। এরা কবে থেকে এ ফায়সালা করার ইখতিয়ার লাভ করলো? যদি এরা এর ইখতিয়ার লাভ করতে চায়, তাহলে বিশ্ব–জাহানের শাসন কর্তৃত্বের আসন লাভ করার জন্য এরা আরশের ওপর পৌঁছে যাবার চেষ্টা করুক। এর ফলে এরা যাকে নিজেদের অনুগ্রহের হকদার মনে করবে তার ওপর অহী নাযিল করবে এবং যাকে আমি হকদার মনে করি তার ওপর অহী নাযিল করবে না। এ বিষয়বস্তু কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে আলোচিত হয়েছে। কারণ কুরাইশ বংশীয় কাফেররা বারবার বলছিল, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেমন করে নবী হয়ে গেলেন? আল্লাহ কি এ কাজের জন্য কুরাইশদের বড় বড় সরদারদের মধ্য থেকে কাউকে পেলেন না? (দেখুন বনী ইসরাঈল, ১০০ আয়াত এবং আয যুখ্‌রুফ ৩১–৩২ আয়াত)

وَمَا يَنْظُرُ هٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ﴿١٥﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١٦﴾ اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْأَيْدِ ۚ إِنَّهٗٓ أَوَّابٌ ﴿١٧﴾ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿١٨﴾ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ۖ كُلٌّ لَّهٗٓ أَوَّابٌ ﴿١٩﴾

২ রুকূ'

এরাও শুধু একটি বিস্ফোরণের অপেক্ষায় আছে, যার পর আর দ্বিতীয় কোন বিস্ফোরণ হবে না।[১৪] আর এরা বলে, হে আমাদের রব! হিসেবের দিনের আগেই আমাদের অংশ দ্রুত আমাদের দিয়ে দাও।[১৫]

হে নবী! এরা যে কথা বলে তার ওপর সবর করো[১৬] এবং এদের সামনে আমার বান্দা দাউদের কাহিনী বর্ণনা করো,[১৭] যে ছিল বিরাট শক্তিধর,[১৮] প্রত্যেকটি ব্যাপারে ছিল আল্লাহ অভিমুখী। পর্বতমালাকে আমি বিজিত করে রেখেছিলাম তার সাথে, ফলে সকাল সাঁঝে তারা তার সাথে আমার গুণগান, পবিত্রতা ও মহিমা প্রচার করতো। পাখপাখালী সমবেত হতো এবং সবাই তার তাসবীহ অভিমুখী হয়ে যেতো।[১৯]

১২. এখানে বলতে মক্কা মু'আয্যমাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যেখানে এরা এসব কথা রচনা করছে সেখানেই একদিন এরা পরাজিত হবে। আর এখানেই একদিন এমন সময় আসবে যখন এরা নতমুখে এমন এক ব্যক্তির সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে যাকে আজ এরা তুচ্ছ মনে করে নবী বলে মেনে নিতে অস্বীকার করছে।

১৩. ফেরাউনের জন্য ذی الاوتاد (কীলকধারী) এ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে যে, তার সালতানাত এমনই মজবুত ছিল যেন যমীনে কীলক পোঁতা রয়েছে। অথবা এই অর্থে যে, তার বিপুল সংখ্যক সৈন্য-সামন্ত যেখানেই অবস্থান করতো সেখানের চারদিকে কেবল তাঁবুর খুঁটিই পোঁতা দেখা যেতো। কিংবা এ অর্থে যে, সে যার প্রতি অসন্তুষ্ট হতো তার দেহে কীলক মেরে মেরে শাস্তি দিতো। আবার সম্ভবত কীলক বলতে মিসরের পিরামিডও বুঝানো যেতে পারে, কেননা এগুলো যমীনের মধ্যে কীলকের মতো গাঁথা রয়েছে!

১৪. অর্থাৎ আযাবের একটিমাত্র ধাক্কা তাদেরকে খতম করে দেবার জন্য যথেষ্ট হবে, দ্বিতীয় কোন ধাক্কার প্রয়োজন হবে না। এ বাক্যের দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, এরপর তারা আর কোন অবকাশ পাবে না। গরুর দুধ দোহন করার সময় এক বাঁট থেকে দুধ টেনে অন্য

এক বাঁটে হাত দেবার মাঝখানে প্রথম বাঁটটিতে দুধ নামতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু অবকাশও তারা পাবে না।

১৫. অর্থাৎ আল্লাহর আযাবের অবস্থা এইমাত্র বর্ণনা করা হয়েছে এবং অন্যদিকে এ নাদানদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, এরা ঠাট্টা করে বলে, তুমি আমাদের যে বিচারদিনের ভয় দেখাচ্ছো তার আসা পর্যন্ত আমাদের ব্যাপারটি মুলতবী করে রেখো না বরং আমাদের হিসেব এখনই চুকিয়ে দাও। আমাদের অংশে যা কিছু সর্বনাশ লেখা আছে তা এখনই নিয়ে এসো।

১৬. ওপরে মক্কার কাফেরদের যেসব কথা বিবৃত হয়েছে এখানে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তাদের এ প্রলাপোক্তি যে, এ ব্যক্তি যাদুকর ও মিথ্যুক, তাদের এ আপত্তি যে, রসূল নিযুক্ত করার জন্য আল্লাহর কাছে কি কেবলমাত্র এ ব্যক্তিটিই থেকে গিয়েছিল এবং এ দোষারোপ যে, এ তাওহীদের দাওয়াত থেকে এ ব্যক্তির উদ্দেশ্য ধর্মীয় প্রচারণা নয় বরং অন্য কোন দুরভিসন্ধি রয়েছে।

১৭. এ ব্যাক্যের আর একটি অনুবাদ এও হতে পারে যে, "আমার বান্দা দাউদের কথা স্মরণ করো।" প্রথম অনুবাদের দিক দিয়ে অর্থ হচ্ছে এই যে, এ কাহিনীতে এদের জন্য একটি শিক্ষা রয়েছে। আর দ্বিতীয় অনুবাদের দৃষ্টিতে এর অর্থ হচ্ছে, এ কাহিনীর স্মৃতি তোমাদের ধৈর্য ধারণ করতে সাহায্য করবে। যেহেতু এ কাহিনী বর্ণনা করার পেছনে উভয় উদ্দেশ্যই রয়েছে তাই এতে এমনসব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যেগুলো থেকে উভয়বিধ অর্থ প্রকাশ পায়। (হযরত দাউদের ঘটনার ওপর বিস্তারিত আলোচনা এর আগে নিম্নোক্ত স্থানগুলোতে এসে গেছে ঃ তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারাহ, ২৭৩; বনী ইসরাঈল, ৭, ৬৩; আল আম্বিয়া ৭০–৭৩' আন্ নাম্‌ল, ১৮–২০ এবং সাবা, ১৪–১৬ টীকাসমূহ)

১৮. মূল শব্দাবলী হচ্ছে ঃ ذَا الْاَيْدِ "হাতওয়ালা" হাত শব্দটি কেবল আরবী ভাষাতেই নয় অন্যান্য ভাষাতেও শক্তি ও ক্ষমতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। হযরত দাউদের জন্য যখন তাঁর গুণ হিসেবে বলা হয় তিনি "হাতওয়ালা" ছিলেন তখন অবশ্যই এর অর্থ হবে, তিনি বিপুল শক্তির অধিকারী ছিলেন। এসব শক্তি বলতে নানা ধরনের শক্তি বুঝানো যেতে পারে। যেমন দৈহিক শক্তি। জালুতের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে তিনি এর প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তি। এর মাধ্যমে তিনি আশপাশের মুশরিক জাতিসমূহকে পরাজিত করে একটি শক্তিশালী ইসলামী সালতানাত কায়েম করেছিলেন। নৈতিকশক্তি এর বদৌলতে তিনি শাহী মসনদে বসেও ফকিরি করে গেছেন সবসময়। আল্লাহকে ভয় করেছেন এবং তাঁর নির্ধারিত সীমারেখা মেনে চলেছেন। ইবাদাতের শক্তি। এর অবস্থা এই ছিল যে, রাষ্ট্র পরিচালনা, শাসন কর্তৃত্ব ও আল্লাহর পথে জিহাদের ব্যস্ততার মধ্যেও বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি হামেশা একদিন পরপর রোজা রেখেছেন এবং প্রতিদিন রাতের এক–তৃতীয়াংশ নামাযে অতিবাহিত করতেন। ইমাম বুখারী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে হযরত আবুদ দারদার (রা) বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন, যখন হযরত দাউদের (আ) কথা আলোচিত হতো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন كَانَ اَعْبَدَ الْبَشَرِ "তিনি ছিলেন সবচেয়ে বেশী ইবাদাতগুযার ব্যক্তি।"

১৯. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল আম্বিয়া, ৭১ টীকা।

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ۝ وَهَلْ اَتٰىكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ ۘ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ۝ اِذْ دَخَلُوْا عَلٰى دَاوٗدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَا تَخَفْ ۚ خَصْمٰنِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَآ اِلٰى سَوَآءِ الصِّرَاطِ ۝ اِنَّ هٰذَآ اَخِيْ ۗ لَهٗ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَّلِيَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ ۗ فَقَالَ اَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِيْ فِي الْخِطَابِ ۝

আমি মজবুত করে দিয়েছিলাম তার সালতানাত, তাকে দান করেছিলাম হিকমত এবং যোগ্যতা দিয়েছিলাম ফায়সালাকারী কথা বলার।[২০] তারপর তোমার কাছে কি পৌঁছেছে মামলাকারীদের খবর, যারা দেওয়াল টপকে তার মহলে পৌঁছে গিয়েছিল?[২১] যখন তারা দাউদের কাছে পৌঁছুলো, তাদেরকে দেখে সে ঘাবড়ে গেলো[২২] তারা বললো, "ভয় পাবেন না, আমরা মামলার দুইপক্ষ। আমাদের একপক্ষ অন্য পক্ষের ওপর বাড়াবাড়ি করেছে। আপনি আমাদের মধ্যে যথাযথ সত্য সহকারে ফায়সালা করে দিন, বেইনসাফী করবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়ে দিন। এ হচ্ছে আমার ভাই,[২৩] এর আছে নিরানব্বইটি দুম্বী এবং আমার মাত্র একটি। সে আমাকে বললো, এ একটি দুম্বীও আমাকে দিয়ে দাও এবং কথাবার্তায় সে আমাকে দাবিয়ে নিল।"[২৪]

২০. অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য জটিল ও অস্পষ্ট হতো না। সমগ্র ভাষণ শোনার পর শ্রোতা একথা বলতে পারতো না যে তিনি কি বলতে চান তা বোধগম্য নয়। বরং তিনি যে বিষয়ে কথা বলতেন তার সমস্ত মূল কথাগুলো পরিষ্কার করে তুলে ধরতেন এবং আসল সিদ্ধান্ত প্রত্যাশী বিষয়টি যথাযথভাবে নির্ধারণ করে দিয়ে তার দ্ব্যর্থহীন জবাব দিয়ে দিতেন। কোন ব্যক্তি জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, বিচার-বিবেচনা ও বাকচাতুর্যের উচ্চতম পর্যায়ে অবস্থান না করলে এ যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না।

২১. এখানে হযরত দাউদের কথা যে উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে তা আসলে এ কাহিনী শুনানো থেকে শুরু হয়েছে। এর আগে তাঁর যে উন্নত গুণাবলীর কথা ভূমিকাস্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র একথা বলা যে, যাঁর সাথে এ ব্যাপারটি ঘটে গেছে সে দাউদ আলাইহিস সালাম কত বড় মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

২২. সোজা পথ ব্যবহার না করে হঠাৎ দেয়াল টপকে দেশের শাসনকর্তার মহলের নির্জনকক্ষে দু'জন লোক পৌঁছে গেছে, এটাই ছিল ঘাবড়ে যাওয়ার বা ভয় পাওয়ার কারণ।

২৩. ভাই মানে মায়ের পেটের ভাই নয় বরং দীনী এবং জাতীয় ভাই।

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٢٥﴾

দাউদ জবাব দিল, "এ ব্যক্তি নিজের দুম্বীর সাথে তোমার দুম্বী যুক্ত করার দাবী করে অবশ্যই তোমার প্রতি জুলুম করেছে।[২৫] *আর আসল ব্যাপার হচ্ছে, মিলেমিশে একসাথে বসবাসকারীরা অনেক সময় একে অন্যের প্রতি বাড়াবাড়ি করে থাকে, তবে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে একমাত্র তারাই এতে লিপ্ত হয় না এবং এ ধরনের লোক অতি অল্প।" (একথা বলতে বলতেই) দাউদ বুঝতে পারলো, এ তো আমি আসলে তাকে পরীক্ষা করেছি, কাজেই সে নিজের রবের কাছে ক্ষমা চাইলো, সিজদানত হলো এবং তার দিকে রুজু করলো।*[২৬] *তখন আমি তার ত্রুটি ক্ষমা করে দিলাম এবং নিশ্চয়ই আমার কাছে তার জন্য রয়েছে নৈকট্যের মর্যাদা ও উত্তম প্রতিদান।*[২৭]

২৪. সামনের আলোচনা ভালোভাবে অনুধাবন করার জন্য একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। অর্থাৎ ফরিয়াদী পক্ষ একথা বলছে না যে, এ ব্যক্তি আমার সে একটি দুম্বীও ছিনিয়ে নিয়েছে এবং নিজের দুম্বীগুলোর মধ্যে তাকে মিশিয়ে দিয়েছে। বরং সে বলছে, এ ব্যক্তি আমার কাছে আমার দুম্বী চাইছে এবং কথাবার্তায় আমাকে দাবিয়ে নিয়েছে। কারণ সে প্রতাপশালী বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং আমি একজন গরীব লোক। এর দাবী রদ করার ক্ষমতা আমার নেই।

২৫. এখানে কারো সন্দেহ করার প্রয়োজন নেই যে, হযরত দাউদ (আ) এক পক্ষের কথা শুনে নিজের সিদ্ধান্ত কেমন করে শুনিয়ে দিলেন। আসল কথা হচ্ছে, বাদীর অভিযোগ শুনে বিবাদী যখন খামুশ হয়ে থাকলো এবং প্রতিবাদে কিছুই বললো না তখন এটি স্বতস্ফূর্তভাবে তার স্বীকৃতিদানের সমর্থক হয়ে গেলো। এ কারণে হযরত দাউদ (আ) স্থির নিশ্চিত হলেন যে, ফরিয়াদী যা বলছে আসল ঘটনাই তাই।

২৬. এ জায়গায় তেলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব কিনা, এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফে'ঈ বলেন, এখানে সিজদা ওয়াজিব নয় বরং এ তো একজন নবীর তাওবা। অন্যদিকে ইমাম আবু হানীফা বলেন, ওয়াজিব। এ প্রসংগে মুহাদ্দিসগণ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে তিনটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। ইকরামার বর্ণনা মতে ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "যেসব আয়াত পাঠ করলে সিজদা ওয়াজিব হয় এটি তার অন্তরভুক্ত নয়। কিন্তু আমি এ

স্থানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সিজদা করতে দেখেছি।" (বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ) সা'দ ইবনে জুবাইর তাঁর কাছ থেকে অন্য যে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন তার শব্দাবলী হচ্ছে ঃ "সূরা 'সা-দ'-এ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদা করেছেন এবং বলেছেন ঃ দাউদ আলাইহিস সালাম তাওবা হিসেবে সিজদা করেছিলেন এবং আমরা শোকরানার সিজদা করি।" অর্থাৎ তাঁর তাওবা কবুল হয়েছে এ জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। (নাসাঈ) তৃতীয় যে হাদীসটি মুজাহিদ তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন তাতে তিনি বলেন, কুরআন মজীদে মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হুকুম দিয়েছেন,

أُولَـٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰهُمُ اقْتَدِهْ

"এরা ছিলেন এমনসব লোক যাদেরকে আল্লাহ সঠিক পথ দেখিয়েছিলেন। কাজেই তুমি এদের পথ অনুসরণ করো।"

এখন যেহেতু হযরত দাউদও একজন নবী ছিলেন এবং তিনি এ স্থানে সিজদা করেছিলেন, তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁকে অনুসরণ করে এ স্থানে সিজদা করেছেন। (বুখারী) এ তিনটি বর্ণনা হচ্ছে হযরত ইবনে আব্বাসের। আর হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার খুতবার মধ্যে সূরা সা-দ পড়েন এবং এ আয়াতে এসে পৌছলে মিম্বার থেকে নিচে নেমে এসে সিজদা করেন এবং তাঁর সাথে সাথে সমবেত সবাইও সিজদা করে। তারপর দ্বিতীয় আর একবার অনুরূপভাবে তিনি এ সূরাটি পড়েন এবং এ আয়াতটি শুনার সাথে সাথে লোকেরা সিজদা করতে উদ্যত হয়। তখন নবী করীম (সা) বলেন, "এটি একজন নবীর তাওবা কিন্তু আমি দেখছি তোমরা সিজদা করতে প্রস্তুত হয়ে গেছো"—একথা বলে তিনি মিম্বার থেকে নেমে আসেন এবং সিজদা করেন। সমবেত সবাইও সিজদা করে। (আবু দাউদ) এসব হাদীস থেকে যদিও সিজদা ওয়াজিব হবার চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না তবুও এতটুকু কথা অবশ্যই প্রমাণিত হয় যে, এ স্থানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সময় সিজদা করেছেন এবং সিজদা না করার তুলনায় এখানে সিজদা করাটা অবশ্যই উত্তম। বরং ইবনে আব্বাসের (রা) তৃতীয় যে বর্ণনাটি আমরা ইমাম বুখারীর বরাত দিয়ে উদ্ধৃত করেছি সেটি ওয়াজিব না হওয়ার তুলনায় ওয়াজিব হওয়ার পাল্লার দিকটি ঝুঁকিয়ে দেয়।

এ আয়াতটি থেকে যে আর একটি বিষয়বস্তু বের হয়ে আসে সেটি হচ্ছে ঃ আল্লাহ এখানে خَرَّ رَاكِعًا (রুকূ'তে অবনত হয়) শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সকল মুফাস্সির এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, এর অর্থ خَرَّ سَاجِدًا (সিজদায় অবনত হয়)। এ কারণে ইমাম আবু হানীফা (র) ও তাঁর সহযোগীগণ এমত পোষণ করেছেন যে, নামাযে বা নামায ছাড়া অন্য অবস্থায় সিজদার আয়াত শুনে বা পড়ে সিজদা না করে কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র রুকূ'ও করতে পারে। কারণ আল্লাহ নিজেই যখন রুকূ' শব্দ বলে সিজদা অর্থ নিয়েছেন তখন জানা গেলো রুকূ' সিজদার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। শাফেঈ ফকীহগণের মধ্যে ইমাম খাত্তাবীও এ মত পোষণ করেন। এ অভিমতটি একটি অভিমত হিসেবে

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿۲۶﴾

(আমি তাকে বললাম) "হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, কাজেই তুমি জনগণের মধ্যে সত্য সহকারে শাসন কর্তৃত্ব পরিচালনা করো এবং প্রবৃত্তির কামনার অনুসরণ করো না, কারণ তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করবে। যারা আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী হয় অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি, যেহেতু তারা বিচার দিবসকে ভুলে গেছে।"[২৮]

নির্ভুল ও যুক্তিযুক্ত সন্দেহ নেই কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের কার্যক্রমের মধ্যে আমরা এর কোন নজির দেখি না যে, সিজদার আয়াত শুনে বা পড়ে সিজদা করার পরিবর্তে তাঁরা রুকূ' করাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। কাজেই এ অভিমত কার্যত বাস্তবায়িত একমাত্র তখনই করা উচিত যখন সিজদা করার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে। নিয়মিতভাবে এ রকম করা সঠিক হবে না। নিয়মিত এ রকম করা ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর সহযোগীদের উদ্দেশ্যও নয়। বরং তাঁরা কেবলমাত্র এর বৈধতার প্রবক্তা।

২৭. এ থেকে জানা যায়, হযরত দাউদের (আ) ত্রুটি তো অবশ্যই হয়েছিল এবং সেটি এমন ধরনের ত্রুটি ছিল যার সাথে দুম্বীর মামলার এক ধরনের সামঞ্জস্য ছিল। তাই তার ফায়সালা শুনাতে গিয়ে সংগে সংগেই তাঁর মনে চিন্তা জাগে, এর মাধ্যমে আমার পরীক্ষা হচ্ছে। কিন্তু এ ত্রুটি এমন মারাত্মক ধরনের ছিল না যা ক্ষমা করা যেতো না অথবা ক্ষমা করা হলেও তাঁকে উন্নত মর্যাদা থেকে নামিয়ে দেয়া হতো। আল্লাহ নিজেই এখানে সুস্পষ্টভাষায় বলছেন, যখন তিনি সিজদায় পড়ে তাওবা করেন তখন তাঁকে কেবল ক্ষমাই করে দেয়া হয়নি বরং দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি যে উন্নত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন তাতেও ফারাক দেখা দেয়নি।

২৮. তাওবা কবুল করার ও মর্যাদা বৃদ্ধির সুসংবাদ দেবার সাথে সাথে মহান আল্লাহ সে সময় হযরত দাউদকে (আ) এ সতর্কবাণী শুনিয়ে দেন। এ থেকে একথা আপনা আপনি প্রকাশ হয়ে যায় যে, তিনি যে কাজটি করেছিলেন তাতে প্রবৃত্তির কামনার কিছু দখল ছিল, শাসন ক্ষমতার অসংগত ব্যবহারের সাথেও তার কিছু সম্পর্ক ছিল এবং তা এমন কোন কাজ ছিল যা কোন ন্যায়নিষ্ঠ শাসকের জন্য শোভনীয় ছিল না।

এখানে এসে আমাদের সামনে তিনটি প্রশ্ন দেখা দেয়। এক, সেটি কি কাজ ছিল? দুই, আল্লাহ পরিষ্কারভাবে সেটি না বলে এভাবে অন্তরালে রেখে সেদিকে ইংগিত করছেন কেন? তিন, এ প্রেক্ষাপটে তার উল্লেখ করা হয়েছে কোন্ সম্পর্কের ভিত্তিতে?

যারা বাইবেল (খৃস্টান ও ইহুদীদের পবিত্র গ্রন্থ) অধ্যয়ন করেছেন তাঁদের কাছে একথা গোপন নেই যে, এ গ্রন্থে হযরত দাউদের বিরুদ্ধে হিত্তীয় উরিয়ার (Uriah the Hittite) স্ত্রীর সাথে যিনা করার এবং তারপর উরিয়াকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে তার স্ত্রীকে বিয়ে করার পরিষ্কার অভিযোগ আনা হয়েছে। আবার এই সংগে একথাও বলা হয়েছে যে, এ মেয়েটি যে এক ব্যক্তির স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে হযরত দাউদের হাওয়ালা করে দিয়েছিল সে-ই ছিল হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের মা। এ সম্পর্কিত পুরো কাহিনীটি বাইবেলের শামুয়েল-২ পুস্তকের ১১-১২ অধ্যায়ে অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। কুরআন নাযিল হবার শত শত বছর পূর্বে এগুলো বাইবেলে সন্নিবেশিত হয়েছিল। সারা দুনিয়ার ইহুদী ও খৃস্টানদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই তাদের এ পবিত্র কিতাব পাঠ করতো অথবা এর পাঠ শুনতো সে-ই এ কাহিনীটি কেবল জানতোই না বরং এটি বিশ্বাসও করতো। তাদেরই মাধ্যমে দুনিয়ায় এ কাহিনীটি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং আজ অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছে গেছে যে, পাশ্চাত্য দেশগুলোতে বনী ইসরাঈল ও ইহুদী ধর্মের ইতিহাস সম্পর্কিত এমন কোন একটি বইও লিখিত হয় না যেখানে হযরত দাউদের বিরুদ্ধে এই দোষারোপের পুনরাবৃত্তি করা হয় না। এ বহুল প্রচলিত কাহিনীতে একথাও লিখিত হয়েছে ঃ

"পরে সদাপ্রভূ দাউদের নিকটে নাথনকে প্রেরণ করিলেন। আর তিনি তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—এক নগরে দুইটি লোক ছিল; তাহাদের মধ্যে একজন ধনবান, আর একজন দরিদ্র। ধনবানের অতি বিস্তর মেষাদি পাল ও গোপাল ছিল। কিন্তু সেই দরিদ্রের আর কিছুই ছিল না, কেবল একটি ক্ষুদ্র মেষবৎসা ছিল, সে তাহাকে কিনিয়া পুষিতে ছিল; আর সেটি তাহার সংগে ও তাহার সন্তানদের সংগে থাকিয়া বাড়িয়া উঠিতেছিল; সে তাহারই খাদ্য খাইত ও তাহারই পাত্রে পান করিত, আর তাহার বক্ষস্থলে শয়ন করিত ও তাহার কন্যার মত ছিল। পরে ঐ ধনবানের গৃহে একজন পথিক আসিল, তাহাতে বাটিতে আগত অতিথির জন্য পান করণার্থে সে আপন মেষাদি পাল ও গোপাল হইতে কিছু লইতে কাতর হইল, কিন্তু সেই দরিদ্রের মেষবৎসাটি লইয়া, যে অতিথি আসিয়াছিল, তাহার জন্য তাহাই পাক করিল। তাহাতে দাউদ সেই ধনবানের প্রতি অতিশয় ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন তিনি নাথনকে কহিলেন, জীবন্ত সদাপ্রভূর দিব্য, যে ব্যক্তি সেই কর্ম করিয়াছে, সে মৃত্যুর সন্তান; সে কিছু দয়া না করিয়া এ কর্ম্ম করিয়াছে, এই জন্য সেই মেষ বৎসার চর্তুগুণ ফিরাইয়া দিবে।

তখন নাথন দাউদকে কহিলেন, আপনিই সেই ব্যক্তি। ইস্রায়েলের ঈশ্বর, সদাপ্রভূ এই কথা কহেন, আমি তোমাকে ইস্রায়েলের উপরে রাজপদে অভিষেক করিয়াছি এবং শৌলের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছি, আর তোমার প্রভূর বাটী তোমাকে দিয়াছি ও তোমার প্রভূর স্ত্রীগণকে তোমার বক্ষস্থলে দিয়াছি এবং ইস্রায়েলের ও জিহূদার কুল তোমাকে দিয়াছি; আর তাহা যদি অল্প হইত, তবে তোমাকে আরও অমুক অমুক বস্তু দিতাম। তুমি কেন সদাপ্রভূর বাক্য তুচ্ছ করিয়া, তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহাই করিয়াছ? তুমি হিত্তীয় উরিয়কে খড়গ দ্বারা আঘাত করাইয়াছ ও তাহার স্ত্রীকে লইয়া আপনার স্ত্রী করিয়াছ, আম্মোন-সন্তানদের খড়গ দ্বারা উরিয়াকে মারিয়া ফেলিয়াছ।"

(২-শমূয়েল ১২ ঃ ১-৯)

এই কাহিনী এবং এর বহুলপ্রচারের উপস্থিতিতে কুরআন মজীদে এ সম্পর্কে কোন বিস্তারিত বর্ণনা দেবার প্রয়োজন ছিল না। এ ধরনের বিষয়গুলোকে আল্লাহর কিতাবে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করাও আল্লাহর রীতি নয়। তাই এখানে পরদার অন্তরালে রেখে এদিকে ইংগিতও করা হয়েছে এবং এ সংগে একথাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আসল ঘটনা কি ছিল এবং কিতাবধারীরা তাকে কিভাবে ভিন্নরূপ দিয়েছে। কুরআন মজীদের উপরোল্লিখিত বর্ণনা থেকে যে আসল ঘটনা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় তা হচ্ছে এই ঃ হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম উরিয়ার (অথবা এ ব্যক্তির যে নাম থেকে থাকুক) কাছে নিছক নিজের মনের এ আকাংখা পেশ করেছিলেন যে, সে যেন নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়। আর যেহেতু এ আকাংখা একজন সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে পেশ করা হয়নি বরং একজন মহাপরাক্রমশালী শাসক এবং জবরদস্ত দীনী গৌরব ও মাহাত্মের অধিকারী ব্যক্তিত্বের পক্ষ থেকে প্রজামন্ডলীর একজন সদস্যের সামনে প্রকাশ করা হচ্ছিল, তাই এ ব্যক্তি কোন প্রকার বাহ্যিক বল প্রয়োগ ছাড়াই তা গ্রহণ করে নেবার ব্যাপারে নিজেকে বাধ্য অনুভব করছিল। এ অবস্থায় হযরত দাউদের (আ) আহবানে সাড়া দেবার জন্য তার উদ্যোগ নেবার পূর্বেই জাতির দু'জন সৎলোক অকস্মাৎ হযরত দাউদের কাছে পৌছে গেলেন এবং একটি কাল্পনিক মামলার আকারে এ বিষয়টি তাঁর সামনে পেশ করলেন। প্রথমে হযরত দাউদ (আ) মনে করেছিলেন এটি যথার্থই তাঁর সামনে পেশকৃত একটি মামলা। কাজেই মামলাটির বিবরণ শুনে তিনি নিজের ফায়সালা শুনিয়ে দিলেন। কিন্তু মুখ থেকে ফায়সালার শব্দগুলো বের হবার সাথে সাথেই তাঁর বিবেক তাঁকে সতর্ক করে দিল যে, এটি একটি রূপক আকারে তাঁর ও ঐ ব্যক্তির বিষয়ের সাথে মিলে যায় এবং যে কাজটিকে তিনি জুলুম গণ্য করছেন তাঁর ও ঐ ব্যক্তির বিষয়ে তার প্রকাশ ঘটছে। এ অনুভূতি মনের মধ্যে সৃষ্টি হবার সাথে সাথেই তিনি আল্লাহর দরবারে সিজদা ও তাওবা করলেন এবং নিজের ঐ কাজটি থেকেও বিরত হলেন।

বাইবেলে এ ঘটনাটি এহেন কলংকিতরূপে চিত্রিত হলো কেমন করে? সামান্য চিন্তা–ভাবনা করলে একথাটিও বুঝতে পারা যায়। মনে হয়, কোন উপায়ে হযরত দাউদ (আ) ঐ ভদ্রমহিলার গুণাবলী জানতে পেরেছিলেন। তাঁর মনে আকাংখা জেগেছিল, এ ধরনের যোগ্যতাসম্পন্না মহিলার পক্ষে একজন সাধারণ অফিসারের স্ত্রী হয়ে থাকার পরিবর্তে রাজরানী হওয়া উচিত। এ চিন্তার বশবর্তী হয়ে তিনি তার স্বামীর কাছে এ ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, সে যেন তাকে তালাক দিয়ে দেয়। বনী ইসরাঈলী সমাজে এটা কোন নিন্দনীয় বিষয় ছিল না বলেই তিনি এতে কোন প্রকার অনিষ্টকারিতা অনুভব করেননি। তাদের সমাজে এটা অত্যন্ত মামুলি ব্যাপার ছিল যে, একজন অন্য একজনের স্ত্রীকে পছন্দ করলে নিসংকোচে তার কাছে আবেদন করতো তোমার স্ত্রীকে আমার জন্য ছেড়ে দাও। এ ধরনের আবেদনে কারো মনে খারাপ প্রতিক্রিয়া হতো না। বরং অনেক সময় এক বন্ধু অন্য বন্ধুকে খুশী করার জন্য নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিতো। যাতে সে তাকে বিয়ে করতে পারে। কিন্তু একথা বলতে গিয়ে হযরত দাউদের মনে এ অনুভূতি জাগেনি যে, একজন সাধারণ লোকের পক্ষ থেকে এ ধরনের ইচ্ছা প্রকাশ করা জুলুম ও বলপ্রয়োগের রূপধারণ না করতে পারে তবে একজন শাসকের পক্ষ থেকে যখন এ ধরনের ইচ্ছা প্রকাশ করা হয় তখন তা বলপ্রয়োগমুক্ত হতে পারে না। উল্লেখিত রূপক মোকদ্দমার মাধ্যমে যখন এ দিকে

তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হলো তখন নির্দ্বিধায় তিনি নিজের ইচ্ছা ত্যাগ করলেন। এভাবে একটি কথার উদ্ভব হয়েছিল এবং তা খতমও হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু পরে কোন এক সময় যখন তাঁর কোন ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা ছাড়াই ঐ ভদ্রমহিলার স্বামী এক যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেলো এবং হযরত দাউদ (আ) তাকে বিয়ে করে নিলেন তখন ইহুদীদের দুষ্ট মানসিকতা কল্পকাহিনী রচনায় প্রবৃত্ত হলো। আর বনী ইসরাঈলীদের একটি দল যখন হযরত সুলাইমানের শত্রু হয়ে গেলো তখন তাদের এ দুষ্ট মানসিকতা দ্রুত কাজ শুরু করে দিল। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন্ নামল, ৫৬ টীকা) এসব উদ্যোগ ও ঘটনাবলীর প্রভাবাধীনে এ কাহিনী রচনা করা হলো যে, হযরত দাউদ (আ) নাউযুবিল্লাহ তাঁর প্রাসাদের ছাদের ওপর উরিয়ার স্ত্রীকে এমন অবস্থায় দেখে নিয়েছিলেন যখন তিনি উলংগ হয়ে গোসল করছিলেন। তিনি তাকে নিজের মহলে ডেকে এনে তার সাথে যিনা করলেন। এতে তিনি গর্ভবতী হয়ে পড়লেন। তারপর তিনি বনী আম্মোন এর মোকাবিলায় উরিয়াকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিলেন এবং সেনাপতি যোয়াবকে হুকুম দিলেন তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে এমন এক জায়গায় নিযুক্ত করতে যেখানে সে নিশ্চিতভাবে নিহত হবে। তারপর যখন সে মারা গেলো, তিনি তার স্ত্রীকে বিয়ে করে নিলেন। এ মহিলার গর্ভে সুলাইমানের (আলাইহিস সালাম) জন্ম হলো। এসব মিথ্যা অপবাদ জালেমরা তাদের পবিত্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছে। এভাবে বংশ পরম্পরায় এর পাঠের ব্যবস্থা করেছে। তারা এসব পড়তে থাকবে এবং নিজেদের দু'জন শ্রেষ্ঠতম ও মহত্তম ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করতে থাকবে। হযরত মূসার (আ) পরে এঁরা দু'জনই ছিলেন তাদের সবচেয়ে বড় পথপ্রদর্শক।

কুরআন ব্যাখ্যাতাগণের একটি দল তো বনী ইসরাঈলের পক্ষ থেকে তাঁদের কাছে এ সম্পর্কিত যেসব কিস্সা কাহিনী এসে পৌঁছেছে সেগুলো হুবহু গ্রহণ করে নিয়েছেন। ইসরাঈলী বর্ণনার মধ্য থেকে কেবলমাত্র যে অংশটুকুতে হযরত দাউদের বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ দেয়া হয়েছিল এবং যেখানে ভদ্রমহিলার গর্ভবতী হয়ে যাবার উল্লেখ ছিল সে অংশটুকু তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁদের উদ্ধৃত বাদবাকি সমস্ত কাহিনী বনী ইসরাঈলের সমাজে যেভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল ঠিক সেভাবেই তাঁদের রচনায় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় দলটি দুম্বীর মোকদ্দমার সাথে সামঞ্জস্য রাখে হযরত দাউদের এমন কোন কর্মতৎপরতার কথা সরাসরি অস্বীকার করেছেন। এর পরিবর্তে তাঁরা নিজেদের পক্ষ থেকে এ কাহিনীর এমন সব ব্যাখ্যা দেন যা একেবারেই ভিত্তিহীন, যেগুলোর কোন উৎস নেই এবং কুরআনের পূর্বাপর আলোচ্য বিষয়ের সাথেও যার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু মুফাস্সিরদের মধ্যে আবার এমন একটি দলও আছে যারা সঠিক তত্ত্ব পেয়ে গেছেন এবং কুরআনের সুস্পষ্ট ইংগিতগুলো থেকে আসল সত্যটির সন্ধান লাভ করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কতিপয় উক্তি অনুধাবন করুন ঃ

মাসরূক ও সাঈদ ইবনে জুবাইর উভয়েই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, "হযরত দাউদ (আ) সে ভদ্র মহিলার স্বামীর কাছে এ ইচ্ছা প্রকাশ করার চাইতে বেশী কিছু করেননি যে, তোমার স্ত্রীকে আমার জন্য ছেড়ে দাও।" (ইবনে জারীর)

আল্লামা যামাখশারী তাঁর কাশ্শাফ তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "আল্লাহ হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের কাহিনীটি যে আকারে বর্ণনা করেছেন তা থেকে তো একথাই

প্রকাশিত হয় যে, তিনি ঐ ব্যক্তির কাছে কেবলমাত্র এ ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন যে, সে তাঁর জন্য যেন তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে।"

আল্লামা আবু বকর জাসসাস এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ঐ ভদ্র মহিলা ঐ ব্যক্তির বিবাহিত স্ত্রী ছিল না বরং ছিল কেবলমাত্র তার বাগদত্তা বা তার সাথে তার বিয়ের কথাবার্তা চলছিল। হযরত দাউদ সে ভদ্র মহিলাকে বিয়ের পয়গাম দিলেন। এর ফলে আল্লাহর ক্রোধ বর্ষিত হলো। কারণ, তিনি তাঁর মু'মিন ভাইয়ের পয়গামের ওপর পয়গাম দিয়েছিলেন। অথচ তাঁর গৃহে পূর্ব থেকেই কয়েকজন স্ত্রী ছিল। (আহকামুল কুরআন) অন্য কয়েকজন মুফাস্সিরও এ অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু একথাটি কুরআনের বর্ণনার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্য রাখে না। কুরআন মজীদে মোকদ্দমা পেশকারীর মুখ নিসৃত শব্দাবলী হচ্ছে ঃ

لِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ اَكْفِلْنِيْهَا

"আমার কাছে একটিমাত্র দুম্বী আছে এবং এ ব্যক্তি বলছে, ওটি আমাকে দিয়ে দাও।" একথাই হযরত দাউদ (আ) তাঁর ফায়সালায়ও বলেছেন ঃ

قَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ

"তোমার দুম্বী চেয়ে সে তোমার প্রতি জুলুম করেছে।" এ রূপকটি হযরত দাউদ ও উরিয়ার কাহিনীর সাথে তখনই খাপ খেতে পারে যখন ঐ ভদ্র মহিলা হবে তার স্ত্রী। একজনের বিয়ের পয়গামের ওপর যদি অন্যজনের পয়গাম দেবার ব্যাপার হতো তাহলে রূপকটি এভাবে বলা হতো ঃ "আমি একটি দুম্বী নিতে চাইছিলাম কিন্তু সে বললো, ওটিও আমার জন্য ছেড়ে দাও।"

কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী এ বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা প্রসংগে লিখেছেন ঃ "আসল ঘটনা মাত্র এতটুকুই যে, হযরত দাউদ (আ) তাঁর নিজের লোকদের মধ্য থেকে একজনকে বলেন, তোমার স্ত্রীকে আমার জন্য ছেড়ে দাও এবং গুরুত্ব সহকারে এ দাবী করেন।............... কুরআন মজীদে একথা বলা হয়নি যে, তাঁর দাবীর কারণে সে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে, হযরত দাউদ তারপর সে মহিলাকে বিয়ে করেন এবং তারই গর্ভে হযরত সুলাইমানের জন্ম হয়।................ যে কথার জন্য ক্রোধ নাযিল হয় সেটি এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, তিনি এক মহিলার স্বামীর কাছে এ অভিলাস ব্যক্ত করেন যে, সে যেন তার স্ত্রীকে তাঁর জন্য ছেড়ে দেয়।......... এ কাজটি সামগ্রিকভাবে কোন বৈধ কাজ হলেও নবুওয়াতের মর্যাদা থেকে এটি ছিল অনেক নিম্নতর ব্যাপার। এ জন্যই তাঁর ওপর আল্লাহর ক্রোধ নাযিল হয় এবং তাঁকে উপদেশও দেয়া হয়।"

এখানে যে প্রেক্ষাপটে এ কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে তার সাথে এ তাফসীরটিই খাপ খেয়ে যায়। বক্তব্য পরম্পরা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে একথা পরিষ্কার জানা যায় যে, কুরআন মজীদের এ স্থানে এ ঘটনাটি দু'টি উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম উদ্দেশ্যটি হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সবর করার উপদেশ দেয়া এবং এ উদ্দেশ্যে

তাঁকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ "এরা তোমার বিরুদ্ধে যা কিছু বলে সে ব্যাপারে সবর করো এবং আমার বান্দা দাউদের কথা স্মরণ করো।" অর্থাৎ তোমাকে শুধুমাত্র যাদুকর ও মিথ্যুক বলা হচ্ছে কিন্তু আমার বান্দা দাউদকে তো জালেমরা ব্যভিচার ও হত্যার ষড়যন্ত্র করার অপবাদ পর্যন্ত দিয়েছিল। কাজেই এদের কাছ থেকে তোমার যাকিছু শুনতে হয় তা বরদাশ্‌ত করতে থাকো। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি হচ্ছে কাফেরদেরকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, তোমরা সব রকমের হিসেব–নিকেশের শংকামুক্ত হয়ে দুনিয়ায় নানা ধরনের বাড়াবাড়ি করে যেতে থাকো কিন্তু যে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধীনে তোমরা এসব কাজ করছো তিনি কাউকেও হিসেব–নিকেশ না নিয়ে ছাড়েন না। এমনকি যেসব বান্দা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ও নৈকট্যলাভকারী হয় তাঁরাও যদি কখনো সামান্যতম ভুল–ভ্রান্তি করে বসেন তাহলে বিশ্ব–জাহানের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী আল্লাহ তাঁদেরকেও কঠিন জবাবদিহির সম্মুখীন করেন। এ উদ্দেশ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে, তাদের সামনে আমার বান্দা দাউদের কাহিনী বর্ণনা করো, যিনি ছিলেন বিচিত্র গুণধর ব্যক্তিত্বের অধিকারী কিন্তু যখন তাঁর দ্বারা একটি অসংগত কাজ সংঘটিত হলো তখন দেখো কিভাবে আমি তাকে তিরস্কার করেছি।

এ সম্পর্কে আর একটি ভুল ধারণাও থেকে যায়। এটি দূর করাও জরুরী। রূপকের মাধ্যমে মোকদ্দমা পেশকারী বলছে, এ ব্যক্তির ৯৯টি দুম্বী আছে এবং আমার আছে মাত্র একটি দুম্বী আর সেটিই এ ব্যক্তি চাচ্ছে। এ থেকে বাহ্যত এ ধারণা হতে পারে যে, সম্ভবত হযরত দাউদের ৯৯ জন স্ত্রী ছিলেন এবং তিনি আর একজন মহিলাকে বিয়ে করে স্ত্রীদের সংখ্যা একশত পূর্ণ করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু আসলে রূপকের প্রত্যেকটি অংশের সাথে হযরত দাউদ ও হিত্তীয় উরিয়ার ঘটনার প্রত্যেকটি অংশের ওপর অক্ষরে অক্ষরে প্রযুক্ত হওয়া জরুরী নয়। প্রচলিত প্রবাদে দশ, বিশ, পঞ্চাশ ইত্যাদি সংখ্যাগুলোর উল্লেখ কেবলমাত্র আধিক্য প্রকাশ করার জন্যই করা হয়ে থাকে সঠিক সংখ্যা উল্লেখ করার জন্য এগুলো বলা হয় না। আমরা যখন কাউকে বলি, দশবার তোমাকে বলেছি তবু তুমি আমার কথায় কান দাওনি তখন এর মানে এ হয় না যে, গুণে গুণে দশবার বলা হয়েছে বরং এর অর্থ হয়, বারবার বলা হয়েছে। এমনি ধরনের ব্যাপার এখানে ঘটেছে। রূপকের আকারে পেশকৃত মোকদ্দমার মাধ্যমে সে ব্যক্তি হযরত দাউদের মধ্যে এ অনুভূতি সৃষ্টি করতে চাচ্ছিলেন যে, আপনার তো কয়েকজন স্ত্রী আছেন এবং তারপরও আপনি অন্য ব্যক্তির স্ত্রীকে বিয়ে করতে চাচ্ছেন। একথাটিই মুফাস্‌সির নিশাপুরী হযরত হাসান বসরী (র) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

لم يكن لداؤد تسع وتسعون امرأة وانما هذا مثل

"হযরত দাউদের ৯৯টি স্ত্রী ছিল না বরং এটি নিছক একটি রূপক।"

(একাহিনী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমার তাফহীমাত গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে। আমি এখানে যে ব্যাখ্যার প্রাধান্য দিয়েছি তার সপক্ষে বিস্তারিত দলিল প্রমাণ যারা জানতে চান তারা উক্ত গ্রন্থের ২৯ থেকে ৪৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়ুন।)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾

৩ রুকূ'

আমি তো আকাশ ও পৃথিবীকে এবং তাদের মাঝখানে যে জগত রয়েছে তাকে অনর্থক সৃষ্টি করিনি।[২৯] এতো যারা কুফরী করেছে তাদের ধারণা আর এ ধরনের কাফেরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুনে ধ্বংস হওয়া। যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আর যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে তাদেরকে আমি কি সমান করে দেবো? মুত্তাকীদেরকে কি আমি দুষ্কৃতকারীদের মতো করে দেবো?[৩০]—এটি একটি অত্যন্ত বরকতপূর্ণ কিতাব,[৩১] যা (হে মুহাম্মাদ!) আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে এরা তার আয়াত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এবং জ্ঞানী ও চিন্তাশীলরা তা থেকে শিক্ষা নেয়।

২৯. অর্থাৎ নিছক খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি এর পেছনে কোন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা নেই, কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ নেই, এর মধ্যে কোন ন্যায় ও ইনসাফ নেই এবং কোন ভালো ও মন্দ কাজের কোন ফল দেখা যায় না এমন নয়। এ উক্তি পেছনের ভাষণের সারনির্যাস এবং সামনের বিষয়বস্তুর মুখবন্ধও। পেছনের ভাষণের পর এ বাক্য বলার উদ্দেশ্যই হচ্ছে এ সত্যটি শ্রোতাদের মনে বসিয়ে দেয়া যে, মানুষকে এখানে লাগাম ছাড়া উটের মতো ছেড়ে দেয়া হয়নি এবং দুনিয়াতে যার যা মন চাইবে তাই করে যেতে থাকবে এ জন্য কারো কাছে কোন জবাবদিহি করতে হবে না এমন কোন শাসকবিহীন অবস্থাও এখানে চলছে না। সামনের দিকের বিষয়বস্তুর মুখবন্ধ হিসেবে এ বাক্য থেকে বক্তব্য শুরু করে একথা বুঝানো হয়েছে যে, যে ব্যক্তি শাস্তি ও পুরস্কারে বিশ্বাস করে না এবং নিজে একথা মনে করে বসেছে যে, সৎকর্মকারী ও দুষ্কৃতকারী উভয়ই শেষ পর্যন্ত মরে মাটি হয়ে যাবে, কাউকে কোন জবাবদিহি করতে হবে না, ভালো বা মন্দ কাজের কেউ কোন প্রতিদান পাবে না, সে আসলে দুনিয়াকে একটি খেলনা এবং এর সৃষ্টিকর্তাকে একজন খেলোয়াড় মনে করে। সে আরো মনে করে, বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা দুনিয়া সৃষ্টি করে এবং তার মধ্যে মানুষ সৃষ্টি করে একটি অর্থহীন কাজ করেছেন। একথাটিই কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে। যেমন,

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ۭ نِعْمَ الْعَبْدُ ۭ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ۝ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ ۝ فَقَالَ اِنِّيْۤ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ ۚ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۝ رُدُّوْهَا عَلَيَّ ۭ فَطَفِقَ مَسْحًۢا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ ۝

আর দাউদকে আমি সুলাইমান (রূপ) সন্তান দিয়েছি,[৩২] সর্বোত্তম বান্দা, বিপুলভাবে নিজের রবের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সে সময় যখন অপরাহ্নে তার সামনে খুব পরিপাটি করে সাজানো দ্রুতগতি সম্পন্ন ঘোড়া পেশ করা হলো।[৩৩] তখন সে বললো, "আমি এ সম্পদ-প্রীতি[৩৪] অবলম্বন করেছি আমার রবের স্মরণের কারণে," এমনকি যখন সে ঘোড়াগুলো দৃষ্টির অগোচরে চলে গেলো তখন (সে হুকুম দিল) তাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনো তারপর তাদের পায়ের গোছায় ও ঘাড়ে হাত বুলাতে লাগলো।[৩৫]

"তোমরা কি মনে করেছো আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের আমার দিকে ফিরে আসতে হবে না।" (আল মু'মিনূন, ১১৫)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ○ مَا خَلَقْنٰهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

"আমি আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে এবং তাদের মাঝখানে যে বিশ্ব-জাহান রয়েছে তাদেরকে খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি তাদেরকে সত্য সহকারে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। আসলে চূড়ান্ত বিচারের দিনে তাদের সবার জন্য উপস্থিতির সময় নির্ধারিত রয়েছে।" (আদ দুখান, ৩৮-৪০)

৩০. অর্থাৎ সৎ ও অসৎ উভয় শেষ পর্যন্ত সমান হয়ে যাবে একথা কি তোমাদের মতে যুক্তিসংগত? কোন সৎলোক তার সততার কোন পুরস্কার পাবে না এবং কোন অসৎলোক তার অসৎকাজের শাস্তি ভোগ করবে না, এ ধারণায় কি তোমরা নিশ্চিন্ত হতে পারো? একথা সুস্পষ্ট, যদি আখেরাত না থাকে, আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন প্রকার জবাবদিহি না হয় এবং মানুষের কাজের কোন পুরস্কার ও শাস্তি না দেয়া হয় তাহলে এর মাধ্যমে আল্লাহ প্রজ্ঞা ও ইনসাফ অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে এবং বিশ্ব-জাহানের সমগ্র ব্যবস্থা একটি অরাজক ব্যবস্থায় পরিণত হয়। এ ধারণার ভিত্তিতে বিচার করলে দুনিয়ায় আদৌ সৎকাজের কোন উদ্যোক্তা এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার জন্য কোন প্রতিবন্ধকতাই থাকে না। আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব নাউযুবিল্লাহ যদি এমনি অরাজক ব্যাপার হয় তাহলে এ পৃথিবীতে যে ব্যক্তি কষ্টভোগ করে নিজে সৎ জীবন যাপন করে এবং মানুষের সংস্কার

সাধনের কাজে আত্মনিয়োগ করে সে বড়ই নির্বোধ। আর যে ব্যক্তি অনুকূল সুযোগ–সুবিধা পেয়ে সব রকমের বাড়াবাড়ি করে লাভের ফল কুড়াতে থাকে এবং সব ধরনের ফাসেকী ও অশালীন কার্যকলাপের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করতে থাকে সে বুদ্ধিমান।

৩১. বরকতের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, "কল্যাণ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি।" কুরআন মজীদকে বরকত সম্পন্ন কিতাব বলার অর্থ হচ্ছে এই যে, এটি মানুষের জন্য একটি অত্যন্ত উপকারী কিতাব। এ কিতাবটি তার জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য সর্বোত্তম বিধান দান করে। এর বিধান মেনে চলায় মানুষের লাভই হয় কেবল, কোন প্রকার ক্ষতির আশংকা নেই।

৩২. হযরত সুলাইমান সম্পর্কিত আলোচনা ইতিপূর্বে নিম্নোক্ত স্থানগুলোতে এসেছে ঃ তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারাহ, ১০৪; বনী ইসরাঈল, ৭; আল আম্বিয়া, ৭০–৭৫; আন নাম্‌ল, ১৮–৫৬ টীকাসমূহে এবং সাবা, ১২–১৪ আয়াতসমূহে।

৩৩. মূলে বলা হয়েছে اَلصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ এর অর্থ হচ্ছে এমনসব ঘোড়া, যেগুলো দাঁড়িয়ে থাকার সময় অত্যন্ত শান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, লাফালাফি দাপাদাপি করে না এবং যখন দৌড়ায় অত্যন্ত দ্রুতবেগে দৌড়ায়।

৩৪. মূলে خَيْر শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবীতে এ শব্দটির ব্যবহার হয় বিপুল সম্পদ অর্থে এবং ঘোড়ার জন্য পরোক্ষ অর্থেও এর ব্যবহার হয়। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম যেহেতু ঐ ঘোড়াগুলোকে আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য রেখেছিলেন তাই তিনি "খাইর" শব্দের মাধ্যমে তাদেরকে চিহ্নিত করেছেন।

৩৫. এ আয়াতগুলোর অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণের মধ্যে বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছে।

একটি দল এগুলোর অর্থ বর্ণনা করে বলেন ঃ হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম ঘোড়া দেখাশুনা ও তাদের দৌড় প্রতিযোগিতায় এতবেশী মশগুল হয়ে পড়েছিলেন যার ফলে আসরের নামাযের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। অথবা কারো কারো কথা মতে নিজের কোন বিশেষ ওযীফা পড়তে ভুলে গিয়েছিলেন। এ ওযীফাটি তিনি পাঠ করতেন আসর ও মাগরিবের নামাযের মাঝামাঝি সময়। কিন্তু সেদিন সূর্য ডুবে গিয়েছিল অথচ তিনি নামায পড়তে বা ওযীফা পাঠ করতে পারেননি। ফলে তিনি হুকুম দিলেন ঃ ঘোড়াগুলো ফিরিয়ে আনো। আর সেগুলো ফিরে আসার পর হযরত সুলাইমান (আ) তরবারির আঘাতে সেগুলোকে হত্যা করতে বা অন্য কথায় আল্লাহর জন্য কুরবানী করতে লাগলেন। কারণ, সেগুলো তাঁকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছিল। এ ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে এ আয়াতগুলোর অনুবাদ এভাবে করা হয়েছে ঃ "তখন সে বললো, আমি এ সম্পদের প্রতি আসক্তি এত বেশী পছন্দ করেছি যার ফলে আমার রবের স্মরণ (আসরের নামায বা বিশেষ ওযীফা) থেকে গাফেল হয়ে গেছি, এমনকি (সূর্য পশ্চিমাকাশের অন্তরালে) লুকিয়ে পড়েছে। (তখন সে হুকুম দিল) ফিরিয়ে আনো ঐ (ঘোড়া) গুলোকে। (আর যখন সেগুলো ফিরে এলো) তখন তাদের পায়ের গোছায় ও ঘাড়ে (তরবারির) হাত চালিয়ে দিল।" এ ব্যাখ্যাটি কোন কোন খ্যাতিমান তাফসীরকারের দেয়া হলেও এটি অগ্রাধিকার

পাওয়ার যোগ্য নয়। কারণ, এখানে তাফসীরকারকে নিজের পক্ষ থেকে তিনটি কথা বাড়াতে হয়, যেগুলোর কোন উৎস ও ভিত্তি নেই। প্রথমত তিনি ধরে নেন, হযরত সুলাইমানের আসরের নামায বা এ সময় তিনি যে একটি বিশেষ ওযীফা পড়তেন তেমন কোন ওযীফা এ কাজে মশগুল থাকার কারণে ছুটে গিয়েছিল। অথচ কুরআনের শব্দাবলী হচ্ছে কেবলমাত্র ঃ

إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي

এ শব্দগুলোর অনুবাদ তো এভাবেও করা যেতে পারে যে, "আমি এ সম্পদ এতবেশী পছন্দ করে ফেলেছি, যার ফলে আমার রবের স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে পড়েছি।" কিন্তু এর মধ্যে আসরের নামায বা কোন বিশেষ ওযীফার অর্থ গ্রহণ করার কোন প্রসংগ বা পূর্বসূত্র নেই। দ্বিতীয়ত তারা এটাও ধরে নেন যে, সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। অথচ সেখানে সূর্যের কোন কথা বলা হয়নি। বরং حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ শব্দাবলী পড়ার পর মানুষের চিন্তা স্বাভাবিকভাবে ফিরে আসে পেছনের আয়াতে উল্লেখিত الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ এর দিকে। তৃতীয়ত এটাও ধরে নেন যে, হযরত সুলাইমান ঘোড়াগুলোর পায়ের গোছায় ও ঘাড়ে খালি হাত বুলাননি বরং তলোয়ারসহ হাত বুলান। অথচ কুরআনে مَسْحًا بِالسَّيْفِ শব্দ বলা হয়নি এবং এখানে এমন কোন প্রসংগ বা পূর্বসূত্রও নেই যার ভিত্তিতে হাত বুলানোকে তরবারিসহ হাত বুলানো অর্থে গ্রহণ করা যেতে পারে। কুরআনের ব্যাখ্যা করার এ পদ্ধতির সাথে আমি নীতিগতভাবে ভিন্নমত পোষণ করি। আমার মতে কুরআনের শব্দাবলীর বাইরে অন্য অর্থ গ্রহণ করা কেবলমাত্র চারটি অবস্থায়ই সঠিক হতে পারে। এক, কুরআনের বাক্যের মধ্যেই তার জন্য কোন পূর্বসূত্র বা প্রসংগ থাকবে। দুই, কুরআনের অন্য কোন জায়গায় তার প্রতি কোন ইংগিত থাকবে। তিন, কোন সহীহ হাদীসে এ সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। অথবা চার, তার অন্য কোন নির্ভরযোগ্য উৎস থাকবে। যেমন ইতিহাসের বিষয় হলে ইতিহাসে এ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যেতে হবে। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের বিষয় হলে নির্ভরযোগ্য তাত্বিক গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে হবে। আর শরীয়াতের বিধানের বিষয় হলো ইসলামী ফিক্হের উৎস এর ব্যাখ্যা পেশ করবে। যেখানে এর মধ্য থেকে কোন একটি বিষয়ও থাকবে না সেখানে নিছক নিজস্বভাবে একটি কিস্‌সা রচনা করে কুরআনের ইবারতের অন্তরভুক্ত করে দেয়া আমার মতে সঠিক নয়।

একটি দল উপরোক্ত অনুবাদ ও ব্যাখ্যার সামান্য বিরোধিতা করেছেন। তারা বলেন, حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ এবং رُدُّوهَا عَلَيَّ উভয়ের মধ্যে যে সর্বনাম রয়েছে সেটি হচ্ছে সূর্য। অর্থাৎ যখন আসরের নামায ছুটে গেলো এবং সূর্য অস্তমিত হলো তখন হযরত সুলাইমান (আ) বিশ্ব–জাহান পরিচালনায় নিযুক্ত কর্মকর্তাগণকে অর্থাৎ ফেরেশতাগণকে বললেন, সূর্যকে ফিরিয়ে আনো, যাতে আসরের সময় ফিরে আসে এবং আমি নামায পড়তে পারি। এর ফলে সূর্য ফিরে এলো এবং তিনি নামায পড়ে নিলেন। কিন্তু এ ব্যাখ্যাটি ওপরের ব্যাখ্যাটির চাইতেও আরো বেশী অগ্রহণযোগ্য। এ জন্য নয় যে, আল্লাহ সূর্যকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম নন বরং এ জন্য যে, আল্লাহ আদৌ এর কোন উল্লেখই করেননি। বরং হযরত সুলাইমানের জন্য যদি এত বড় মু'জিযার প্রকাশ ঘটতো তাহলে অবশ্যই তা উল্লেখযোগ্য হওয়া উচিত ছিল। এর আরো একটি কারণ এই যে, সূর্যের অস্তমিত হয়ে

তারপর আবার ফিরে আসা এমন একটি অসাধারণ ঘটনা যে, যদি সত্যিই তা ঘটে থাকতো তাহলে দুনিয়ার ইতিহাসে তা কখনো অনুল্লেখিত থাকতো না। এ ব্যাখ্যার সপক্ষে তাঁরা কতিপয় হাদীস পেশ করেও একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, সূর্যের অস্তমিত হয়ে পুনর্বার ফিরে আসার ঘটনা মাত্র একবার ঘটেনি বরং কয়েকবার এ ঘটনা ঘটেছে। মি'রাজের ঘটনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য সূর্যকে ফিরিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে। খন্দকের যুদ্ধের সময়ও নবী করীমের (সা) জন্য তাকে ফিরিয়ে আনা হয়। আর হযরত আলীর (রা) জন্যও ফিরিয়ে আনা হয় যখন নবী করীম (সা) তাঁর কোলে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছিলেন এবং তাঁর আসরের নামায কাযা হয়ে গিয়েছিল। নবী করীম (সা) সূর্যকে ফিরিয়ে আনার দোয়া করেন এবং তা ফিরে আসে। কিন্তু যে ব্যাখ্যার সমর্থনে এ হাদীসগুলো বর্ণনা করা হয়েছে এগুলো থেকে তার সপক্ষে প্রমাণ পেশ করা তার চাইতেও দুর্বল। হযরত আলী সম্পর্কে যে হাদীস বর্ণনা করা হয়ে থাকে তার সকল বর্ণনা পরম্পরা ও বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে ইবনে তাইমিয়া একে বনোয়াট ও জাল হাদীস প্রমাণ করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেন, এর কোন ভিত্তি নেই। ইবনে জওযী বলেন, নিসন্দেহে এটি জাল হাদীস। খন্দকের যুদ্ধের সময় সূর্যকে ফিরিয়ে আনার হাদীসটিও অনেক মুহাদ্দিসের মতে যঈফ এবং অনেকের মতে বানোয়াট। অন্যদিকে মি'রাজের হাদীসের আসল ব্যাপারটি হচ্ছে, যখন নবী করীম (সা) মক্কার কাফেরদের কাছে মি'রাজের রাতের অবস্থা বর্ণনা করছিলেন তখন কাফেররা তাঁর কাছে প্রমাণ চাইলো। তিনি বললেন, বাইতুল মাকদিসের পথে অমুক জায়গায় একটি কাফেলার দেখা পেয়েছিলাম এবং তাদের সাথে অমুক ঘটনা ঘটেছিল। কাফেররা জিজ্ঞেস করলো, সে কাফেলাটি কবে মক্কায় পৌঁছুবে? তিনি জবাব দিলেন, অমুক দিন। যখন সেদিনটি এলো কুরাইশরা সারাদিন কাফেলার অপেক্ষা করতে লাগলো, এমনকি সন্ধ্যা হয়ে গেলো। তখন নবী (সা) দোয়া করলেন যেন সূর্য ততক্ষণ পর্যন্ত অস্তমিত না হয় যতক্ষণ কাফেলা না এসে যায়। কাজেই দেখা গেলো সূর্য ডুবার আগে তারা পৌঁছে গেছে। এ ঘটনাটিকে কোন কোন বর্ণনাকারী এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, সেদিন দিনের সময় এক ঘন্টা বাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল এবং এই বাড়তি সময় পর্যন্ত সূর্য দাঁড়িয়েছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, এ ধরনের হাদীস এত বড় অস্বাভাবিক ঘটনার প্রমাণের ক্ষেত্রে সাক্ষ হিসেবে যথেষ্ট হতে পারে কি? যেমন আমি আগেই বলে এসেছি, সূর্যের ফিরে আসা বা ঘন্টা খানিক আটকে থাকা কোন সাধারণ ঘটনা নয়। এ ধরনের ঘটনা যদি সত্যিই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকতো তাহলে সারা দুনিয়ায় হৈ চৈ পড়ে যেতো। দু-চারটে খবরে ওয়াহিদের (যে হাদীসের বর্ণনাকারী কোন স্তরে মাত্র একজন) মধ্যে তার আলোচনা কেমন করে সীমাবদ্ধ থাকতো?

মুফাস্‌সিরগণের তৃতীয় দলটি এ আয়াতগুলোর এমন অর্থ গ্রহণ করেন যা একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি এর শব্দগুলো পড়ে এ থেকে গ্রহণ করতে পারে। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী ঘটনা কেবলমাত্র এতটুকু ঃ হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের সামনে যখন উন্নত ধরনের ভাল জাতের ঘোড়ার একটি পাল পেশ করা হলো তখন তিনি বললেন, অহংকার বা আত্মম্ভরিতা করার জন্য অথবা শুধুমাত্র আত্মস্বার্থের খাতিরে এ সম্পদ আমার কাছে প্রিয় নয়। বরং এসব জিনিসের প্রতি আমার আকর্ষণকে আমি আমার রবের কালেমা বুলন্দ করার জন্য পছন্দ করে থাকি। তারপর তিনি সে ঘোড়াগুলোর দৌড় করালেন এমনকি

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ﴿٣٤﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖ رُخَآءً حَيْثُ اَصَابَ ﴿٣٦﴾ وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّغَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾ وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ ﴿٣٨﴾ هٰذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾ وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٤٠﴾

আর (দেখো) সুলাইমানকেও আমি পরীক্ষায় ফেলেছি এবং তার আসনে নিক্ষেপ করেছি একটি শরীর। তারপর সে রুজু করলো এবং বললো, হে আমার রব! আমাকে মাফ করে দাও এবং আমাকে এমন রাজত্ব দান করো যা আমার পরে আর কারো জন্য শোভন হবে না; নিসন্দেহে তুমিই আসল দাতা।[৩৬] *তখন আমি বাতাসকে তার জন্য অনুগত করে দিলাম, যা তার হুকুমে যেদিকে সে চাইতো মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হতো।*[৩৭] *আর শয়তানদেরকে বিজিত করে দিয়েছি, সব ধরনের গৃহনির্মাণ কারিগর ও ডুবুরী এবং অন্য যারা ছিল শৃংখলিত।*[৩৮] *(আমি তাকে বললাম) "এ আমার দান, তোমাকে ইখতিয়ার দেয়া হচ্ছে, যাকে চাও তাকে দাও এবং যাকে চাও তাকে দেয়া থেকে বিরত থাকো, কোন হিসেব নেই।*[৩৯] *অবশ্যই তার জন্য আমার কাছে রয়েছে নৈকট্যের মর্যাদা ও শুভ পরিণাম।*[৪০]

সেগুলো দৃষ্টির বাইরে চলে গেলো। এরপর তিনি সেগুলো ফেরত আনালেন। সেগুলো ফেরত আসার পর ইবনে আব্বাসের বক্তব্য অনুযায়ী :

جعل يمسح اعراف الخيل وعرا قيبها حُبًّالها

"তিনি তাদের পায়ের গোছায় ও ঘাড়ে আদর করে হাত বুলাতে লাগলেন।" আমাদের মতে এ ব্যাখ্যাটিই সঠিক। কারণ কুরআন মজীদের শব্দাবলীর সাথে এটি পূর্ণ সামঞ্জস্য রাখে এবং অর্থকে পূর্ণতা দান করার জন্য এর মধ্যে এমন কোন কথা বাড়িয়ে বলতে হয় না যা কুরআনে নেই, কোন সহীহ হাদীসে নেই এবং বনী ইসরাঈলের ইতিহাসেও নেই।

এ প্রসংগে একথাটাও সামনে থাকা উচিত যে, আল্লাহ হযরত সুলাইমানের পক্ষে এ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন : نعم العبد انه اواب (নিজের রবের দিকে বেশী বেশী ফিরে আসা ব্যক্তিই হচ্ছে সর্বোত্তম বান্দা) এর প্রশংসা বাণী উচ্চারণ করার অব্যবহিত

পরেই করেছেন। এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, আসলে একথা বলাই এখানে উদ্দেশ্য ছিল যে, দেখো, সে আমার কত ভাল বান্দা ছিল, বাদশাহীর সাজ সরঞ্জাম তার কাছে পছন্দনীয় ছিল দুনিয়ার খাতিরে নয় বরং আমার জন্য, নিজের পরাক্রান্ত অশ্ববাহিনী দেখে দুনিয়াদার ও বৈষয়িক ভোগ লালসায় মত্ত শাসনকর্তাদের মতো সে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেনি বরং সে সময়ও তার মনোজগতে ভেসে উঠেছে আমারই স্মৃতি।

৩৬. বক্তব্যের ধারাবাহিকতা অনুসারে এখানে একথা বলাই মূল উদ্দেশ্য এবং পেছনের আয়াতগুলো এরই জন্য মুখবন্ধ হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। যেমন প্রথমে হযরত দাউদের প্রশংসা করা হয়েছে, তারপর যে ঘটনার ফলে তিনি ফিত্‌নার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন সেটি উল্লেখ করা হয়েছে, একথা বলা হয়েছে যে, মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ নিজের এত প্রিয় বান্দাকেও জবাবদিহি না করে ছাড়েননি, তারপর তাঁর এ কার্যক্রম দেখান যে, ফিত্‌না সম্পর্কে সজাগ করে দেবার সাথে সাথেই তিনি তাওবা করেন এবং আল্লাহর সামনে মাথা নত করে নিজের ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে ফিরে আসেন, অনুরূপভাবে এখানেও বক্তব্য বিন্যাস এভাবে করা হয়েছে ঃ প্রথমে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের উচ্চ মর্যাদা ও মহিমান্বিত বন্দেগীর কথা বলা হয়েছে, তারপর বলা হয়েছে, তাঁকেও পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়েছিল, তারপর তাঁর বন্দেগীর এ কৃতিত্ব দেখান যে, যখন তাঁর সিংহাসনে একটি দেহাবয়ব এনে ফেলে দেয়া হয় তখন সংগে সংগেই তিনি নিজের পদস্খলন সম্পর্কে সজাগ হন, নিজের রবের সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং যে কথার জন্য তিনি ফিত্‌নার সম্মুখীন হয়েছিলেন নিজের সে কথা ও কার্যক্রম থেকে ফিরে আসেন। অন্যকথায় বলা যায়, এ দু'টি কাহিনী থেকে আল্লাহ একই সংগে দু'টি কথা বুঝাতে চান। এক, তাঁর নিরপেক্ষ সমালোচনা, পর্যালোচনা ও জবাবদিহি থেকে সাধারণ তো দূরের কথা নবীরাও বাঁচতে পারেননি। দুই, অপরাধ করে ঘাড় বেঁকা করে থাকা বান্দার জন্য সঠিক কর্মনীতি নয়। বরং তার কাজ হচ্ছে যখনই সে নিজের ভুল অনুভব করতে পারবে তখনই বিনীতভাবে নিজে রবের সামনে ঝুঁকে পড়বে। এ কর্মনীতিরই ফল স্বরূপ মহান আল্লাহ এ মনীষীদের পদস্খলনগুলো কেবল ক্ষমাই করে দেননি বরং তাঁদের প্রতি আরো বেশী দয়া–দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করেছেন।

এখানে আবার এ প্রশ্ন দেখা দেয় যে, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম যে ফিত্‌নার সম্মুখীন হয়েছিলেন সেটি কেমন ফিত্‌না ছিল? তাঁর আসনের ওপর একটি দেহাবয়ব এনে ফেলে দেয়ার অর্থ কি? এ দেহাবয়ব এনে তাঁর আসনে ফেলে দেয়া তাঁর জন্য কোন্‌ ধরনের সতর্কীকরণ ছিল যার ফলে তিনি তাওবা করেন? এর জবাবে মুফাস্‌সিরগণ চারটি ভিন্ন ভিন্ন মত অবলম্বন করেছেন।

একটি দল একটি বিরাট কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এর বিস্তারিত বিবরণের ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে আবার বহু ধরনের মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কিন্তু তাদের সবার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে ঃ হযরত সুলাইমানের থেকে এই ত্রুটি সংঘটিত হয়েছিল যে, তাঁর মহলে এক বেগম সাহেবা চল্লিশ দিন পর্যন্ত মূর্তি পূজায় লিপ্ত ছিলেন এবং তিনি ছিলেন এ ব্যাপারে বেখবর। অথবা তিনি কয়েকদিন পর্যন্ত গৃহমধ্যে বসেছিলেন এবং কোন মজলুমের ফরিয়াদ শুনেননি। এর ফলে তিনি যে শাস্তি পেয়েছিলেন তা ছিল এই যে, এক শয়তান যে কোনভাবেই তাঁর এমন একটি আংটি চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল যার বদৌলতে তিনি জিন

ও মানুষ জাতি এবং বাতাসের ওপর রাজত্ব করতেন। আংটি হাতছাড়া হয়ে যেতেই হযরত সুলাইমানের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব খতম হয়ে গিয়েছিল এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত তিনি দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতে থাকলেন। এই অন্তরবর্তীকালে সেই শয়তান সুলাইমানের রূপ ধারণ করে রাজত্ব করতে থাকলো। সুলাইমানের সিংহাসনে একটি দেহাবয়ব এনে ফেলে দেয়ার অর্থ হচ্ছে তাঁর সিংহাসনে উপবেশনকারী এই শয়তান। কেউ কেউ একথাও বলে ফেলেছেন যে, সে সময় এই শয়তানের হাত থেকে সুলাইমানের হারেমের মহিলাদের সতীত্বও সংরক্ষিত থাকেনি। শেষ পর্যন্ত দরবারের আমাত্যবর্গ, পারিষদ ও উলামায়ে কেরামের মনে তার কার্যকলাপ দেখে সন্দেহের সৃষ্টি হলো এবং তারা মনে করতে থাকলেন, এ ব্যক্তি সুলাইমান নয়। কাজেই তারা তার সামনে তাওরাত খুলে মেলে ধরলেন এবং সে ভয়ে পালিয়ে গেলো। পথে তার হাত থেকে আংটি খুলে গিয়ে সমুদ্রে পড়ে গেলো অথবা সে নিজেই তা সমুদ্রে নিক্ষেপ করলো। একটি মাছ তা গিলে ফেললো। ঘটনাক্রমে সে মাছটি হযরত সুলাইমানের হস্তগত হলো। মাছটি রান্না করার জন্য তিনি তার পেট কেটে ফেললেন। সেখান থেকে আংটি বের হয়ে পড়লো। আংটি হাতে আসার সাথে সাথেই জিন, মানুষ ইত্যাদি সবাই সালাম করতে করতে তাঁর সামনে হাজির হয়ে গেলো।—এ পুরো কাহিনীটিই ছিল একটি পৌরানিক গালগল্প। নওমুসলিম আহলি কিতাবগণ তালমুদ ও অন্যান্য ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে সংগ্রহ করে এটি মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। আর আশ্চর্যের ব্যাপার, আমাদের বড় বড় পণ্ডিতগণ একে কুরআনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার বিস্তারিত ব্যাখ্যা মনে করে নিজেদের ভাষায় এগুলো বর্ণনা করেছেন। অথচ সুলাইমানের আংটির কোন সত্যতা নেই। হযরত সুলাইমানের কৃতিত্ব কোন আংটির ভেল্কিবাজি ছিল না। শয়তানদেরকেও আল্লাহ নবীদের আকৃতি ধরে আসার ও মানুষকে গোমরাহ করার ক্ষমতা দেননি। তাছাড়া আল্লাহ সম্পর্কে এমন কোন ধারণাও করা যেতে পারে না যে, তিনি কোন নবীর কোন ভুলের শাস্তি এমন ফিত্‌নার আকৃতিতে দান করবেন যার ফলে শয়তান নবী হয়ে একটি উম্মাতের সমগ্র জনগোষ্ঠীর সর্বনাশ করে দেবে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, কুরআন নিজেই এ তাফসীরের প্রতিবাদ করছে। সামনের আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, হযরত সুলাইমান যখন এ পরীক্ষার সম্মুখীন হন এবং তিনি আমার কাছে ক্ষমা চান তখন আমি বায়ু ও শয়তানদের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করেদিলাম। কিন্তু এ তাফসীর এর বিপরীতে একথা বলছে যে, আংটির কারণে শয়তানরা পূর্বেই হযরত সুলাইমানের হুকুমের অনুগত হয়ে গিয়েছিল। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, যেসব মনীষী এ তাফসীর বর্ণনা করেছেন তাঁরা পরবর্তী আয়াত কি বলছে তা আর দেখেননি।

দ্বিতীয় দলটি বলেন, ২০ বছর পর হযরত সুলাইমানের একটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে। শয়তানরা বিপদ গণে। তারা মনে করে যদি হযরত সুলাইমানের পর তাঁর এ পুত্র বাদশাহ হয়ে যায় তাহলে তাদেরকে আবার একই গোলামীর জিঞ্জির বহন করে চলতে হবে। তাই তারা তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। হযরত সুলাইমান একথা জানতে পারেন। তিনি পুত্রকে মেঘের মধ্যে লুকিয়ে রাখেন। সেখানেই তার লালন–পালনের ব্যবস্থা করেন। এটিই ছিল সেই ফিত্‌না যার সম্মুখীন তিনি হয়েছিলেন। অর্থাৎ আল্লাহর ওপর ভরসা করার পরিবর্তে তিনি মেঘের হেফাজতের ওপর ভরসা করেছিলেন। এর শাস্তি

তাঁকে এভাবে দেয়া হয় যে, সে শিশুটি মরে গিয়ে তাঁর সিংহাসনের ওপর এসে পড়ে।—এ কাহিনীটিও আগাগোড়া ভিত্তিহীন ও উদ্ভট এবং স্পষ্ট কুরআন বিরোধী। কারণ এখানেও ধারণা করে নেয়া হয়েছে যে, বায়ু ও শয়তানরা পূর্ব থেকেই হযরত সুলাইমানের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। অথচ কুরআন পরিষ্কার ভাষায় তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন হবার ব্যাপারটিকে এ ফিত্‌নার পরবর্তীকালের ঘটনা বলে উল্লেখ করছে।

তৃতীয় দলটি বলেন, একদিন হযরত সুলাইমান কসম খান, আজ রাতে আমি সত্তরজন স্ত্রীর কাছে যাবো এবং প্রত্যেকের গর্ভে একজন করে আল্লাহর পথের মুজাহিদ জন্ম দেব। কিন্তু একথা বলতে গিয়ে তিনি ইন্‌শাআল্লাহ বলেননি। এর ফলে মাত্র একজন স্ত্রী গর্ভবতী হয় এবং তাঁর গর্ভেও একটি অসমাপ্ত ও অপরিপক্ক শিশুর জন্ম হয়। দাই শিশুটিকে এনে হযরত সুলাইমানের আসনের ওপর ফেলে দেয়। এ হাদীসটি হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন রাবীর মাধ্যমে এটি উদ্ধৃত করেছেন। বুখারী শরীফেই এ হাদীসটি যেসব রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে তার কোনটিতে স্ত্রীদের সংখ্যা বলা হয়েছে ৬০, কোনটিতে ৭০, কোনটিতে ৯০, কোনটিতে ৯৯ আবার কোনটিতে ১০০ও বলা হয়েছে। সনদের দিক দিয়ে এর মধ্য থেকে অধিকাংশই শক্তিশালী এবং রেওয়ায়াত হিসেবে এগুলোর নির্ভুলতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা যেতে পারে না। কিন্তু এ হাদীসের বিষয়বস্তু সুস্পষ্টভাবে সাধারণ বিবেক–বুদ্ধির বিরোধী। এর ভাষা বলছে, একথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো এভাবে বলেননি যেভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। বরং তিনি সম্ভবত ইহুদীদের মিথ্যা ও অপবাদমূলক কিচ্ছা–কাহিনীর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে কোন পর্যায়ে একে এভাবে উদাহরণস্বরূপ বর্ণনা করে থাকবেন এবং শ্রোতার মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়ে থাকবে যে, নবী করীম (সা) নিজেই এ ঘটনা বর্ণনা করছেন। এ ধরনের রেওয়ায়াতকে নিছক জোরে লোকদের হজম করাবার চেষ্টা করানো দীনকে হাস্যাস্পদ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই হিসেব কষে দেখতে পারেন, শীতের দীর্ঘতম রাত ও এশা থেকে নিয়ে ফজর পর্যন্ত দশ এগারো ঘন্টার বেশী সময় হয় না। যদি স্ত্রীদের সংখ্যা কমপক্ষে ৬০ জন বলে মেনে নেয়া যায়, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায়, সেই রাতে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম কোন প্রকার বিশ্রাম না নিয়েই অবিরাম ১০ বা ১১ ঘন্টা ধরে প্রতি ঘন্টায় ৬ জন স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে থেকেছেন। কার্যত এটা কি সম্ভব? আর একথাও কি আশা করা যেতে পারে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাস্তব ঘটনা হিসেবে একথাটি বর্ণনা করে থাকবেন? তারপর হাদীসে কোথাও একথা বলা হয়নি যে, কুরআন মজীদে হযরত সুলাইমানের আসনের ওপর যে দেহাবয়বটি ফেলে রাখার কথা বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে এ অপরিণত শিশু। তাই নবী করীম (সা) এ ঘটনাটি এ আয়াতের ব্যাখ্যা হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন তা বলা যায় না। তাছাড়া এ সন্তানের জন্মের পর হযরত সুলাইমানের ইস্‌তিগ্‌ফার করার কথা তো বোধগম্য হতে পারে কিন্তু তিনি ইস্‌তিগ্‌ফারের সাথে সাথে "আমাকে এমন রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করো যা আমার পরে আর কারো জন্য শোভনীয় নয়"—এ দোয়াটি কেন করেছিলেন তা বোধগম্য নয়।

এর আর একটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং ইমাম রাযী এটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সেটি হচ্ছে, হযরত সুলাইমান কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন অথবা কোন

বিপদের কারণে এত বেশী চিন্তান্বিত ছিলেন যার ফলে তিনি শুকাতে শুকাতে হাড্ডিচর্মসার হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এ ব্যাখ্যাটি কুরআনের শব্দের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। কুরআনের শব্দাবলী হচ্ছে ঃ "আমি সুলাইমানকে পরীক্ষায় ফেলে দিলাম এবং তার আসনের ওপর একটি দেহাবয়ব নিক্ষেপ করলাম তারপর সে ফিরে এলো।" এ শব্দগুলো পড়ে কোন ব্যক্তিও একথা বুঝতে পারে না যে, এ দেহাবয়ব বলতে হযরত সুলাইমানকেই বুঝানো হয়েছে। এ থেকে তো পরিষ্কার জানা যায়, এ পরীক্ষার সম্মুখীন করার মূলে হযরত সুলাইমানের কোন ভুলচুক বা পদস্খলন ছিল। এ ভুলচুকের কারণে তাঁকে সতর্ক করে জানিয়ে দেয়া হয় যে, আপনার আসনের ওপর একটি দেহ এনে ফেলে দেয়া হয়েছে। এর ফলে নিজের ভুলচুক বুঝতে পেরে তিনি ফিরে আসেন।

আসলে এটি কুরআন মজীদের জটিলতম স্থানগুলোর মধ্যে একটি। চূড়ান্তভাবে এর ব্যাখ্যা করার মতো কোন নিশ্চিত বুনিয়াদ আমাদের কাছে নেই। কিন্তু হযরত সুলাইমানের দোয়ার এ শব্দাবলী ঃ "হে আমার রব! আমাকে মাফ করে দিন এবং আমাকে এমন রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করুন যা আমার পরে আর কারোর জন্য শোভনীয় নয়" যদি বনী ইসরাঈলের ইতিহাসের আলোকে পড়া যায় তাহলে আপাতদৃষ্টে অনুভূত হবে, তাঁর মনে সম্ভবত এ আকাংখা ছিল যে, তাঁর পরে তাঁর ছেলে হবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত এবং শাসন ও রাষ্ট্র কর্তৃত্ব আগামীতে তাঁর পরিবারের মধ্যে অব্যাহত থাকবে। এ জিনিসটিকেই আল্লাহ তাঁর জন্য ফিত্‌না গণ্য করেছেন এবং এ ব্যাপারে তিনি এমন সময় সজাগ হয়েছেন যখন তাঁর পুত্র যুবরাজ রাজুবয়াম এমন এক অযোগ্য তরুণ হিসেবে সামনে এসে গিয়েছিল যার আচরণ পরিষ্কার বলে দিচ্ছিল যে, সে দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিমাস সালামের সালতানাত চারদিনও টিকিয়ে রাখতে পারবে না। তাঁর আসনে একটি দেহ নিক্ষেপ করার ভাবার্থ সম্ভবত এই হবে যে, যে পুত্রকে তিনি সিংহাসনে বসাতে চাচ্ছিলেন সে ছিল একটি অযোগ্য পুত্র। এ সময় তিনি নিজের আকাংখা পরিহার করেন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে এ মর্মে আবেদন জানান যে, এ বাদশাহী যেন আমার পর শেষ হয়ে যায় এবং আমার পরে আমার বংশের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা অব্যাহত রাখার আকাংখা আমি প্রত্যাহার করলাম। বনী ইসরাঈলের ইতিহাস থেকেও একথাই জানা যায় যে, হযরত সুলাইমান নিজের পরে আর কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করার জন্য অসিয়াত করে যাননি এবং কারো আনুগত্য করার জন্য লোকদেরকে বাধ্যও করেননি। পরবর্তীকালে তাঁর রাষ্ট্রীয় পারিষদবর্গ রাজুবয়ামকে সিংহাসনে বসান। কিন্তু সামান্য কিছুদিন যেতে না যেতেই বনী ইসরাঈলের দশটি গোত্র উত্তর ফিলিস্তিনের এলাকাটি নিয়ে আলাদা হয়ে যায় এবং একমাত্র ইয়াহুদা গোত্র বাইতুল মাকদিসের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সাথে সংযুক্ত থাকে।

৩৭. সূরা আল আম্বিয়ার ব্যাখ্যায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আম্বিয়া, ৭৪ টীকা) তবে এখানে একটি কথা সুস্পষ্ট করা প্রয়োজন। সেটি হচ্ছে, সূরা আল আম্বিয়ায় যেখানে বাতাসকে নিয়ন্ত্রিত করার কথা বলা হয়েছে সেখানে الريح عاصفة (প্রবল বায়ু) শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়েছে। আর এখানে সে একই বাতাস সম্পর্কে বলা হচ্ছে, تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖ رُخَاءً (তার হুকুমে সে মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হতো)। এর অর্থ হচ্ছে, সে বাতাস মূলত প্রবল ছিল যেমন বাতাস চালিত জাহাজ চালাবার জন্য প্রবল বায়ুর প্রয়োজন হয়। কিন্তু হযরত সুলাইমানের জন্য

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿٤١﴾ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ ۖ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٤٣﴾

৪ রুকূ'

আর স্মরণ করো আমার বান্দা আইয়ূবের কথা[৪১] যখন সে তার রবকে ডাকলো এই বলে যে, শয়তান আমাকে কঠিন যন্ত্রণা ও কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।[৪২] (আমি তাকে হুকুম দিলাম) তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত করো, এ হচ্ছে ঠাণ্ডা পানি গোসল করার জন্য এবং পান করার জন্য।[৪৩] আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম তার পরিবার পরিজন এবং সেই সাথে তাদের মতো আরো,[৪৪] নিজের পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ এবং বুদ্ধি ও চিন্তাশীলদের জন্য শিক্ষণীয় হিসেবে।[৪৫]

তাকে এ অর্থে মৃদুমন্দ করে দেয়া হয়েছিল যে, তাঁর বাণিজ্য বহর যেদিকে সফর করতে চাইতো সেদিকেই তা প্রবাহিত হতো।

৩৮. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আম্বিয়া, ৭৫ টীকা, আন নাম্‌ল ২৩, ২৮, ৪৫, ৪৬ ও ৪৭ টীকা।—শয়তান বলতে জিন বুঝানো হয়েছে। আর শৃংখলিত জিন বলতে এমনসব সেবক জিন বুঝানো হয়েছে যাদেরকে বিভিন্ন দুষ্কর্মের কারণে বন্দী করা হতো। যেসব বেড়ী ও জিঞ্জির দিয়ে এ জিনগুলোকে বাঁধা হতো সেগুলো লোহা নির্মিত হওয়া এবং বন্দীদেরকেও মানুষদের মতো প্রকাশ্যে শৃংখলিত দেখতে পাওয়াও অপরিহার্য ছিল না। মোটকথা তাদেরকে এমন পদ্ধতিতে বন্দী করা হতো যার ফলে তারা পালাবার ও কুকর্ম করার সুযোগ পেতো না।

৩৯. এ আয়াতের তিনটি অর্থ হতে পারে। এক, এটি আমার বেহিসেব দান। তুমি যাকে ইচ্ছা দিতে পারো, যাকে ইচ্ছা নাও দিতে পারো। দুই, এটি আমার দান। যাকে ইচ্ছা দাও এবং যাকে ইচ্ছা না দাও, দেয়া বা না দেয়ার জন্য তোমাকে কোন জবাবদিহি করতে হবে না। কোন কোন মুফাস্‌সির এর আরো একটি অর্থ করেছেন। সেটি হচ্ছে, এ শয়তানদেরকে পুরোপুরি তোমার অধীনে দিয়ে দেয়া হয়েছে। এদের মধ্য থেকে যাকে চাও মুক্তি দিয়ে দাও এবং যাকে চাও আটকে রাখো, এ জন্য তোমাকে কোন জবাবদিহি করতে হবে না।

৪০. এখানে একথা উল্লেখ করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা জানিয়ে দেয়া যে, বান্দার অহংকার আল্লাহর কাছে যত বেশী অপ্রিয় ও অপছন্দনীয় তার দীনতা ও বিনয়ের প্রকাশ তাঁর কাছে তত বেশী প্রিয়। বান্দা যদি অপরাধ করে এবং সতর্ক করার কারণে উল্টো আরো বেশী বাড়াবাড়ি করে, তাহলে এর পরিণাম তাই হয় যা সামনের দিকে আদম ও ইবলিসের কাহিনীতে বর্ণনা করা হচ্ছে। পক্ষান্তরে বান্দার যদি সামান্য পদস্খলন হয়ে যায়

এবং সে তাওবা করে দীনতা সহকারে তার রবের সামনে মাথা নত করে, তাহলে তার প্রতি এমন সব দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করা হয়, যা ইতিপূর্বে দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিমাস সালামের ওপর প্রদর্শিত হয়। হযরত সুলাইমান ইস্তিগ্ফারের পরে যে দোয়া করেছিলেন আল্লাহ তাকে অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করেন এবং বাস্তবে তাঁকে এমন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দান করেন যা তাঁর পূর্বে কেউ লাভ করেনি এবং তাঁর পরে আজো পর্যন্ত কাউকে দেয়া হয়নি। বায়ু নিয়ন্ত্রণ ও জিনদের ওপর কর্তৃত্ব এ দু'টি এমন ধরনের অসাধারণ শক্তি যা মানুষের ইতিহাসে একমাত্র হযরত সুলাইমানকেই দান করা হয়েছে। অন্য কাউকে এর কোন অংশ দেয়া হয়নি।

৪১. এ নিয়ে চতুর্থবার হযরত আইয়ূবের কথা কুরআন মজীদে আলোচিত হয়েছে। এর আগে সূরা নিসার ১৬৩, সূরা আন'আমের ৮৪ ও সূরা আম্বিয়ার ৮৩–৮৪ আয়াতে এ সম্পর্কিত আলোচনা এসেছে। ইতিপূর্বে সূরা আম্বিয়ার ব্যাখ্যায় আমি তাঁর অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। (তাফহীমুল কুরআন, আল আম্বিয়া, ৭৬–৭৯ টীকা)

৪২. এর অর্থ এ নয় যে, শয়তান আমাকে রোগগ্রস্ত করে দিয়েছে এবং আমাকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে বরং এর সঠিক অর্থ হচ্ছে, রোগের প্রচণ্ডতা, ধন–সম্পদের বিনাশ এবং আত্মীয়–স্বজনদের মুখ ফিরিয়ে নেবার কারণে আমি যে কষ্ট ও যন্ত্রণার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছি তার চেয়ে বড় কষ্ট ও যন্ত্রণা আমার জন্য হচ্ছে এই যে, শয়তান তার প্ররোচনার মাধ্যমে আমাকে বিপদগ্রস্ত করছে। এ অবস্থায় সে আমাকে আমার রব থেকে হতাশ করার চেষ্টা করে, আমাকে আমার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ করতে চায় এবং আমি যাতে অধৈর্য হয়ে উঠি সে প্রচেষ্টায় রত থাকে। হযরত আইয়ূবের ফরিয়াদের এ অর্থটি দু'টি কারণে আমাদের কাছে প্রাধান্য লাভের যোগ্য। এক, কুরআন মজীদের দৃষ্টিতে আল্লাহ শয়তানকে কেবলমাত্র প্ররোচণা দেবার ক্ষমতাই দিয়েছেন। আল্লাহর বন্দেগীকারীদেরকে রোগগ্রস্ত করে এবং তাদেরকে শারীরিক যন্ত্রণা দিয়ে বন্দেগীর পথ থেকে সরে যেতে বাধ্য করার ক্ষমতা তাদেরকে দেননি। দুই, সূরা আম্বিয়ায় যেখানে হযরত আইয়ূব আল্লাহর কাছে তাঁর রোগের ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করছেন সেখানে তিনি শয়তানের কোন কথা বলেন না। বরং তিনি কেবল বলেন,

إِنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ

"আমি রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছি এবং তুমি পরম করুণাময়।"

৪৩. অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমে মাটিতে পায়ের আঘাত করতেই একটি পানির ঝরণা প্রবাহিত হলো। এর পানি পান করা এবং এ পানিতে গোসল করা ছিল হযরত আইয়ূবের জন্য তাঁর রোগের চিকিৎসা। সম্ভবত হযরত আইয়ূব কোন কঠিন চর্মরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। বাইবেলও একথাই বলে যে, তাঁর সারা শরীর ফোড়ায় ভরে গিয়েছিল।

৪৪. হাদীস থেকে জানা যায়, এ রোগে আক্রান্ত হবার পর হযরত আইয়ূবের স্ত্রী ছাড়া আর সবাই তাঁর সংগ ত্যাগ করেছিল এমন কি সন্তানরাও তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। এ দিকে ইংগিত করেই আল্লাহ বলছেন, যখন আমি তার রোগ নিরাময় করলাম, সমস্ত পরিবারবর্গ তাঁর কাছে ফিরে এলো এবং তারপর আমি তাঁকে আরো সন্তান দান করলাম।

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ۗ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ۗ نِعْمَ الْعَبْدُ ۗ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿۴۴﴾ وَاذْكُرْ عِبٰدَنَاۤ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِىْ وَالْاَبْصَارِ ﴿۴۵﴾ اِنَّاۤ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿۴۶﴾ وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ ﴿۴۷﴾ وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ۗ وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ ﴿۴۸﴾

(আর আমি তাকে বললাম) এক আটি ঝাড়ু নাও এবং তা দিয়ে আঘাত করো এবং নিজের কসম ভংগ করো না।[৪৬] আমি তাকে সবরকারী পেয়েছি, উত্তম বান্দা ছিল সে, নিজের রবের অভিমুখী।[৪৭]

আর আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের কথা স্মরণ করো। তারা ছিল বড়ই কর্মশক্তির অধিকারী ও বিচক্ষণ[৪৮] আমি একটি নির্ভেজাল গুণের ভিত্তিতে তাদেরকে নির্বাচিত করেছিলাম এবং তা ছিল পরলোকের স্মরণ।[৪৯] নিশ্চিতভাবে আমার কাছে তারা বিশিষ্ট সৎলোক হিসেবে গণ্য। আর ইসমাঈল, আল ইয়াসা'[৫০] ও যুল কিফ্ল-এর[৫১] কথা স্মরণ করো। এরা সবাই সৎলোকদের অন্তরভুক্ত ছিল।

৪৫. অর্থাৎ একজন বুদ্ধিমানের জন্য এর মধ্যে এ শিক্ষা রয়েছে যে, ভালো অবস্থায় আল্লাহকে ভুলে গিয়ে তার বিদ্রোহী হওয়া উচিত নয় এবং খারাপ অবস্থায় তার আল্লাহ থেকে নিরাশ হওয়াও উচিত নয়। তাকদীরের ভালমন্দ সরাসরি এক ও লাশরীক আল্লাহর ক্ষমতার আওতাধীন। তিনি চাইলে মানুষের সবচেয়ে ভাল অবস্থাকে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় পরিবর্তিত করে দিতে পারেন আবার চাইলে সবচেয়ে খারাপ অবস্থার মধ্য দিয়ে তাকে সবচেয়ে ভাল অবস্থায় পৌছিয়ে দিতে পারেন। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির সকল অবস্থায় তাঁর ওপর ভরসা এবং তাঁর প্রতি পুরোপুরি নির্ভর করা উচিত।

৪৬. এ শব্দগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হযরত আইয়ূব (আ) রুগ্ন অবস্থায় নারাজ হয়ে কাউকে মারার কসম খেয়েছিলেন। (কথিত আছে, স্ত্রীকে মারার কসম খেয়েছিলেন।) আর এ কসম খাওয়ার সময় তিনি একথাও বলেছিলেন যে, তোমাকে এতো ঘা দোর্‌রা মারবো। আল্লাহ যখন তাঁকে সুস্থতা দান করলেন এবং যে রোগগ্রস্ত অবস্থায় ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি এ কসম খেয়েছিলেন সে ক্রোধ স্তিমিত হয়ে গেলো তখন তিনি একথা মনে করে অস্থির হয়ে পড়লেন যে, কসম পুরা করতে গেলে অযথা একজন নিরপরাধকে মারতে হয় এবং কসম ভেঙে ফেললেও গোনাহগার হতে হয়। এ

উভয় সংকট থেকে আল্লাহ তাঁকে উদ্ধার করলেন। আল্লাহ তাঁকে হুকুম দিলেন, একটি ঝাড়ু নাও, তাতে তুমি যে পরিমাণ কোড়া মারার কসম খেয়েছিলে সে পরিমাণ কাঠি থাকবে এবং সে ঝাড়ু দিয়ে কথিত অপরাধীকে একবার আঘাত করো এর ফলে তোমার কসমও পুরা হয়ে যাবে এবং সেও অযথা কষ্টভোগ করবে না।

কোন কোন ফকীহ এ রেওয়ায়াতটিকে একমাত্র হযরত আইয়ূবের জন্য নির্ধারিত মনে করেন। আবার কতিপয় ফকীহের মতে অন্য লোকেরাও এ সুবিধাদান থেকে লাভবান হতে পারে। প্রথম অভিমতটি উদ্ধৃত করেছেন ইবনে আসাকির হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এবং আবু বকর জাস্সাস মুজাহিদ থেকে। ইমাম মালেকেরও অভিমত এটিই। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেঈ দ্বিতীয় অভিমতটি অবলম্বন করেছেন। তাঁরা বলেন, কোন ব্যক্তি যদি তার খাদেমকে দশ ঘা কোড়া মারার কসম খেয়ে বসে এবং পরে দশটি কোড়া মিলিয়ে তাকে এমনভাবে কেবলমাত্র একটি আঘাত করে যার ফলে কোড়াগুলোর প্রত্যেকটির কিছু অংশ তার গায়ে ছুঁয়ে যায় তাহলে তার কসম পুরো হয়ে যাবে।

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেশী রোগগ্রস্ত বা দুর্বল হবার কারণে যে যিনাকারী একশো দোর্‌রার আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা রাখতো না তার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি প্রয়োগ করার ব্যাপারে এ আয়াতে বিবৃত পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। আল্লামা আবু বকর জাস্সাস হযরত সাঈদ ইবনে সা'দ ইবনে উবাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বনী সা'য়েদে এক ব্যক্তি যিনা করে। সে এমন রুগ্ন ছিল যে, তাকে অস্থি-চর্মসার বলা যেতো। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুকুম দিলেন ঃ

خذوا عثقالا فيه مائة شمراخ فاضربوه بها ضربة واحدة

"খেজুরের একটি ডাল নাও, যার একশোটি শাখা রয়েছে এবং তা দিয়ে একবার এ ব্যক্তিকে আঘাত করো।" (আহকামুল কুরআন)

মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, তাবারানী, আবদুর রাজ্জাক ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থসমূহেও এর সমর্থক কতিপয় হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। সেগুলোর মাধ্যমে একথা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোগী ও দুর্বলের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিই অবলম্বন করেছিলেন। তবে ফকীহগণ এ ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ করেছেন যে, প্রত্যেকটি শাখা বা পাতার কিছু না কিছু অংশ অপরাধীর গায়ে অবশ্যই লাগা উচিত এবং একটি আঘাতই যথেষ্ট হলেও অপরাধীকে তা যেন কোন না কোন পর্যায়ে আহত করে। অর্থাৎ কেবল স্পর্শ করা যথেষ্ট নয় বরং আঘাত অবশ্যই করতে হবে।

এখানে এ প্রশ্নও দেখা দেয় যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম খেয়ে বসে এবং পরে জানা যায় যে, সে বিষয়টি অসংগত, তাহলে তার কি করা উচিত। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ ব্যাপারে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, এ অবস্থায় মানুষের পক্ষে যা ভালো, তাই করা উচিত এবং এটিই তার কাফ্‌ফারা। অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে, এ অসংগত কাজের পরিবর্তে মানুষের ভাল কাজ করা এবং নিজের

কসমের কাফ্ফারা আদায় করে দেয়া উচিত। এ আয়াতটি এ দ্বিতীয় হাদীসটিকে সমর্থন করে। কারণ একটি অসংগত কাজ না করাই যদি কসমের কাফ্ফারা হতো তাহলে আল্লাহ হযরত আইয়ূবকে একথা বলতেন না যে, তুমি একটি ঝাড়ু দিয়ে আঘাত করে নিজের কসম পুরা করে নাও। বরং বলতেন, তুমি এমন অসংগত কাজ করো না এবং এটা না করাই তোমার কসমের কাফ্ফারা। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আন নূর, ২০ টীকা)

এ আয়াত থেকে একথাও জানা যায় যে, কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম খেলে সংগে সংগেই তা পুরা করা অপরিহার্য হয় না। হযরত আইয়ূব রোগগ্রস্ত অবস্থায় কসম খেয়েছিলেন এবং তা পূর্ণ করেন পুরোপুরি সুস্থ হবার পর এবং সুস্থ হবার পরও তাও সংগে সংগেই পুরা করেননি।

কেউ কেউ এ আয়াতকে শরয়ী বাহানাবাজীর সপক্ষে যুক্তি হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। সন্দেহ নেই, হযরত আইয়ূবকে যা করতে বলা হয়েছিল তা একটি বাহানা ও ফন্দিই ছিল। কিন্তু তা কোন ফরয থেকে বাঁচার জন্য করতে বলা হয়নি বরং বলা হয়েছিল একটি খারাপ কাজ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। কাজেই শরীয়াতে একমাত্র এমন বাহানা ও ফন্দি জায়েয যা মানুষের নিজের সত্তা থেকে অথবা অন্য কোন ব্যক্তি থেকে জুলুম, গোনাহ ও অসৎ প্রবণতা দূর করার জন্য করা হয়ে থাকে। নয়তো হারামকে হালাল বা ফরয বাতিল অথবা সৎকাজ থেকে রেহাই পাবার জন্য বাহানাবাজি করা বা ফন্দি আঁটা গোনাহর উপরি গোনাহ। বরং এর সূত্র গিয়ে কুফরীর সাথে মেলে। কারণ এসব অপবিত্র উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি বাহানা করে সে যেন অন্য কথায় আল্লাহকে ধোঁকা দিতে চায়। যেমন যে ব্যক্তি যাকাত দেয়া থেকে রেহাই পাবার জন্য বছর শেষ হবার আগে নিজের সম্পদ অন্য কারো কাছে স্থানান্তর করে সে নিছক একটি ফরয থেকেই পলায়ন করে না বরং সে একথাও মনে করে যে, আল্লাহ তার এ প্রকাশ্য কাজ দেখে প্রতারিত হবে এবং তাকে ফরযের আওতাভুক্ত মনে করবে না। এ ধরনের 'হীলা' বা বাহানার বিষয়সমূহ যেসব ফকীহ তাদের কিতাবের অন্তরভুক্ত করেছেন, শরীয়াতের বিধান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করার জন্য এসব বাহানাবাজীর আশ্রয় নিতে উদ্বুদ্ধ করা তাঁদের উদ্দেশ্য নয় বরং তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যদি কোন ব্যক্তি গোনাহকে আইনের রূপ দান করে গা বাঁচিয়ে বের হয়ে আসে, তাহলে কাযী বা শাসক তাকে পাকড়াও করতে পারেন না। তার শাস্তির ভার আল্লাহর হাতে সোপর্দ হয়ে যায়।

৪৭. এ প্রেক্ষাপটে একথা বলার জন্য হযরত আইয়ূবের কথা বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নেক বান্দারা যখন বিপদের ও কঠিন সংকটের মুখোমুখি হন তখন তাঁরা তাঁদের রবের কাছে অভিযোগ করেন না বরং ধৈর্য সহকারে তাঁর চাপিয়ে দেয়া পরীক্ষাকে মেনে নেন এবং তাতে উত্তীর্ণ হবার জন্য তাঁর কাছেই সাহায্য চান। কিছুকাল আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার পর যদি বিপদ অপসারিত না হয় তাহলে তাঁর থেকে নিরাশ হয়ে অন্যদের দরবারে হাত পাতবেন, এমন পদ্ধতি তাঁরা অবলম্বন করেন না। বরং তারা ভাল করেই জানেন, যা কিছু পাওয়ার আল্লাহর কাছ থেকেই পাওয়া যাবে। তাই বিপদের ধারা যতই দীর্ঘ হোক না কেন তারা তাঁরই করুণাপ্রার্থী হন। এ জন্য তারা এমন দান ও করুণা লাভে ধন্য হন যার দৃষ্টান্ত হযরত আইয়ূবের জীবনে পাওয়া যায়। এমনকি যদি তারা কখনো

অস্থির হয়ে কোন প্রকার নৈতিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শিকার হয়ে পড়েন তাহলেও আল্লাহ তাদেরকে দুষ্কৃতিমুক্ত করার জন্য একটি পথ বের করে দেন যেমন হযরত আইয়ূবের জন্য বের করে দিয়েছিলেন।

৪৮. মূলে বলা হয়েছে ঃ أُولِى الْأَيْدِىْ وَالْأَبْصَارِ (হস্তধারী ও দৃষ্টিধারীগণ) ইতিপূর্বে যেমন আমরা বলেছি, হাত মানে শক্তি ও সামর্থ। আর এ নবীগণকে শক্তি ও সামর্থের অধিকারী বলার অর্থ হচ্ছে, তাঁরা অত্যন্ত সক্রিয় ও কর্মশক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁরা আল্লাহর আনুগত্যকারী ও গোনাহ থেকে সংরক্ষিত থাকার প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী ছিলেন। দুনিয়ায় আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার জন্য তাঁরা বিরাট প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। দৃষ্টি অর্থ চোখের দৃষ্টি নয় বরং অন্তরদৃষ্টি। তাঁরা সত্যদর্শী ও সূক্ষ্ম সত্যদ্রষ্টা ছিলেন। দুনিয়ায় তাঁরা চোখ বন্ধ করে চলতেন না। বরং চোখ খুলে জ্ঞান ও তাত্বিক পর্যবেক্ষণের পূর্ণ আলোকে সঠিক সোজা পথ দেখে চলতেন। এ শব্দগুলোর মধ্যে এ দিকে একটি সূক্ষ্ম ইংগিত করা হয়েছে যে, দুষ্কৃতিকারী ও পথভ্রষ্টরা আসলে হাত ও চোখ উভয়টি থেকে বঞ্চিত। আসলে যারা আল্লাহর পথে কাজ করে তারাই হস্তধারী এবং যারা সত্যের আলো ও মিথ্যার অন্ধকারের মধ্যে পার্থক্য করে তারাই দৃষ্টির অধিকারী।

৪৯. অর্থাৎ তাঁদের যাবতীয় সাফল্যের মূল কারণ ছিল এই যে, তাঁদের মধ্যে বৈষয়িক স্বার্থলাভের আকাংখা ও বৈষয়িক স্বার্থপূজার সামান্যতম গন্ধও ছিল না। তাঁদের সমস্ত চিন্তা ও প্রচেষ্টা ছিল আখেরাতের জন্য। তাঁরা নিজেরাও আখেরাতের কথা স্মরণ করতেন এবং অন্যদেরকেও স্মরণ করিয়ে দিতেন। তাই আল্লাহ তাঁদেরকে দু'টি মর্যাদা দান করেছেন। বৈষয়িক স্বার্থ চিন্তায় ব্যাপৃত লোকদের ভাগ্যে কখনো এটা ঘটেনি। এ প্রসংগে এ সূক্ষ্ম বিষয়টিও দৃষ্টি সমক্ষে থাকা উচিত যে, এখানে আল্লাহ আখেরাতের জন্য কেবলমাত্র "আদ্‌দার" (সেই ঘর বা আসল ঘর) শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর মাধ্যমে এখানে এ সত্যটি বুঝানোই উদ্দেশ্য যে, এ দুনিয়া আদতে মানুষের ঘর নয় বরং এটি নিছক একটি অতিক্রম করার জায়গা এবং একটি মুসাফিরখানা মাত্র। এখান থেকে মানুষকে অবশ্যই বিদায় নিতে হবে। আসল ঘর হচ্ছে সেই আখেরাতের ঘর। যে ব্যক্তি তাকে সুসজ্জিত করার চিন্তা করে সে-ই দূরদৃষ্টির অধিকারী এবং আল্লাহর কাছে তাকে অবশ্যই পছন্দনীয় মানুষ হওয়া উচিত। অন্যদিকে যে ব্যক্তি এ মুসাফিরখানায় নিজের সামান্য কয়েক দিনের অবস্থানস্থলকে সুসজ্জিত করার জন্য এমনসব কাজ করে যার ফলে আখেরাতের আসল ঘর তার জন্য বিরাণ হয়ে যায়, তার বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং স্বাভাবিকভাবেই এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ পছন্দ করতে পারেন না।

৫০. কুরআন মজীদে মাত্র দু' জায়গায় তাঁর কথা বলা হয়েছে। সূরা আল আন'আমের ৮৬ আয়াতে এবং এ জায়গায়। উভয় জায়গায় কোন বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি। বরং কেবলমাত্র নবীদের কথা বর্ণনা প্রসংগে তাঁর নাম নেয়া হয়েছে। তিনি ছিলেন বনী ইসরাঈলের নেতৃস্থানীয় নবীদের একজন। জর্দান নদীর উপকূলে আবেল মেহুলা (Abel Meholah) এর অধিবাসী ছিলেন। ইহুদী ও খৃষ্টানরা তাঁকে ইলীশার (Elisha) নামে স্মরণ করে। হযরত ইলিয়াস আলাইহিস সালাম যে সময় সিনাই উপদ্বীপে আশ্রয় নিয়েছিলেন তখন কয়েকটি বিশেষ কাজে তাঁকে সিরিয়ায় ও ফিলিস্তিনে ফিরে যাওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছিল। এর মধ্যে একটি কাজ ছিল হযরত আল ইয়াসা'কে তার স্থলাভিষিক্ত

هَٰذَا ذِكْرٌ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٤٩﴾ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ ﴿٥٠﴾ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿٥١﴾ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ ﴿٥٢﴾ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ﴿٥٤﴾

এছিল একটি স্মরণ। (এখন শোনো) মুত্তাকীদের জন্য নিশ্চিতভাবেই রয়েছে উত্তম আবাস—চিরন্তন জান্নাত, যার দরোজাগুলো খোলা থাকবে তাদের জন্য।[৫২] *সেখানে তারা বসে থাকবে হেলান দিয়ে, বহুবিধ ফলমূল ও পানীয়ের ফরমাশ করতে থাকবে এবং তাদের কাছে থাকবে লজ্জাবতী কম বয়সী স্ত্রীরা।*[৫৩] *এসব এমন জিনিস যেগুলো হিসেবের দিন দেবার জন্য তোমাদের কাছে অংগীকার করা হচ্ছে। এ হচ্ছে আমার রিযিক, যা কখনো শেষ হবে না।*

করার জন্য প্রস্তুত করতে হবে। এ হুকুম অনুযায়ী হযরত ইলিয়াস তাঁর জনবসতিতে গিয়ে পৌছুলেন। তিনি দেখলেন, বারো জোড়া গরু সামনে নিয়ে হযরত আল ইয়াসা' জমিতে চাষ দিচ্ছেন এবং তিনি নিজে বারোতম জোড়ার সাথে আছেন। হযরত ইলিয়াস তাঁর পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁর ওপর নিজের চাদর নিক্ষেপ করলেন এবং তিনি তৎক্ষণাত ক্ষেতখামার ছেড়ে দিয়ে তাঁর সাথে চলে এলেন। (রাজাবলি ১৯ ঃ ১৫–২১) প্রায় দশ বারো বছর তিনি তাঁর প্রশিক্ষণের অধীনে থাকলেন। তারপর আল্লাহ তাঁকে উঠিয়ে নেবার পর তিনি হযরত ইলিয়াসের স্থলে নিযুক্তি লাভ করলেন। (২–রাজাবলি ঃ ২) বাইবেলের ২–রাজাবলি পুস্তকের ২ থেকে ১৩ অধ্যায় পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তা থেকে জানা যায়, উত্তর ফিলিস্তিনের ইসরাঈলী সালতানাত যখন শিরক ও মূর্তি পূজা এবং নৈতিক অপবিত্রতায় ডুবে যেতে থাকলো তখন শেষ পর্যন্ত তিনি নিমশির পৌত্র যিহোশাফটের পুত্র যেহুকে রাজ পরিবারের বিরুদ্ধে দাঁড় করালেন। এ রাজ পরিবারের মাধ্যমেই ইসরাঈলে এসব দুষ্কৃতি বিস্তার লাভ করেছিল। যেহু কেবল বা'আলপূজাই বন্ধ করলো না বরং এ দুষ্কৃতকারী পরিবারের প্রত্যেককে হত্যা করলো, একটি শিশুকেও জীবিত ছাড়লো না। কিন্তু ইসরাঈলের শিরায় উপশিরায় যে দুষ্কৃতি অনুপ্রবেশ করেছিল এ সংস্কার বিপ্লব তাকে পুরোপুরি নির্মূল করতে পারলো না। হযরত আল ইয়াসা'আর মৃত্যুর পর তা ঝড়ের বেগে অগ্রসর হলো। এমনকি এরপর সামোরিয়দের ওপর আসিরীয়রা একের পর এক হামলা শুরু করে দিল। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, বনী ইসরাঈল, ৭ এবং সাফ্ফাত, ৭০–৭১ টীকা)

৫১. হযরত যুল কিফ্ল–এর উল্লেখও কুরআনে দু' জায়গায়ই এসেছে। সূরা আল আম্বিয়ায় এবং এখানে। এ সম্পর্কে আমার অনুসন্ধানলব্ধ আলোচনা আমি সূরা আল আম্বিয়াতেই করে এসেছি। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আম্বিয়া, ৮১ টীকা)

هَٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ ﴿٥٥﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٥٦﴾ هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ﴿٥٧﴾ وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ﴿٥٨﴾ هَٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۖ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ ﴿٥٩﴾ قَالُوا بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ ۖ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا ۖ فَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٦٠﴾ قَالُوا رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ﴿٦١﴾ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ ﴿٦٢﴾ أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ﴿٦٣﴾ إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿٦٤﴾

এতো হচ্ছে মুত্তাকীদের পরিণাম আর বিদ্রোহীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম আবাস জাহান্নাম, যেখানে তারা দগ্ধীভূত হবে, সেটি বড়ই খারাপ আবাস। এ হচ্ছে তাদের জন্য, কাজেই তারা স্বাদ আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানির, পুঁজের[৫৪] ও এ ধরনের অন্যান্য তিক্ততার। (নিজেদের অনুসারীদের জাহান্নামের দিকে আসতে দেখে তারা পরস্পর বলাবলি করবে ঃ) "এ একটি বাহিনী তোমাদের কাছে ঢুকে চলে আসছে, এদের জন্য কোন স্বাগত সম্ভাষণ নেই, এরা আগুনে ঝলসিত হবে।" তারা তাদেরকে জবাব দেবে, "না, বরং তোমরাই ঝলসিত হচ্ছো, কোন অভিনন্দন নেই তোমাদের জন্য, তোমরাই তো আমাদের পূর্বে এ পরিণাম এনেছো, কেমন নিকৃষ্ট এ আবাস!" তারপর তারা বলবে, "হে আমাদের রব! যে ব্যক্তি আমাদের এ পরিণতিতে পৌঁছুবার ব্যবস্থা করেছে তাকে দোজখে দ্বিগুণ শাস্তি দাও।" আর তারা পরস্পর বলাবলি করবে, কি ব্যাপার, আমরা তাদেরকে কোথাও দেখছি না, যাদেরকে আমরা দুনিয়ায় খারাপ মনে করতাম?[৫৫] আমরা কি অযথা তাদেরকে বিদ্রূপের পাত্র বানিয়ে নিয়েছিলাম অথবা তারা কোথাও দৃষ্টি অগোচরে আছে?" অবশ্যই একথা সত্য, দোজখবাসীদের মধ্যে এসব বিবাদ হবে।

৫২. মূলে বলা হয়েছে ঃ مُفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, এসব জান্নাতে তারা দ্বিধাহীনভাবে ও নিশ্চিন্তে ঘোরাফেরা করবে এবং কোথাও তাদের কোনপ্রকার বাধার সম্মুখীন হতে হবে না। দুই, জান্নাতের দরোজা খোলার জন্য তাদের কোন প্রচেষ্টা চালাবার দরকার হবে না বরং শুধুমাত্র তাদের মনে ইচ্ছা জাগার সাথে

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ مُنذِرٌۭ ۖ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾ رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّٰرُ ﴿٦٦﴾ قُلْ هُوَ نَبَؤٌا۟ عَظِيمٌ ﴿٦٧﴾ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٦٨﴾ مَا كَانَ لِىَ مِنْ عِلْمٍۭ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰٓ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٦٩﴾ إِن يُوحَىٰٓ إِلَىَّ إِلَّآ أَنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌۭ مُّبِينٌ ﴿٧٠﴾

৫ রুকূ'

হে নবী![৫৬] এদেরকে বলো, "আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র।[৫৭] আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত মাবুদ নেই। তিনি একক, সবার ওপর আধিপত্যশীল, আকাশ ও পৃথিবীর মালিক এবং এ দু'য়ের মধ্যে অবস্থানকারী সমস্ত জিনিসের মালিক, পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল।" এদেরকে বলো, "এটি একটি মহাসংবাদ, যা শুনে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও।"[৫৮]

(এদেরকে বলো,) "উর্ধলোকে যখন বিতর্ক হচ্ছিল সে সময়ের কোন জ্ঞান আমার ছিল না। আমাকে তো অহীর মাধ্যমে একথাগুলো এ জন্য জানিয়ে দেয়া হয় যে আমি সুস্পষ্ট সতর্ককারী।"

সাথে সাথেই তা খুলে যাবে। তিন, জান্নাতের ব্যবস্থাপনায় যেসব ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত থাকবে তারা জান্নাতের অধিবাসীদেরকে দেখতেই তাদের জন্য দরোজা খুলে দেবে। এ তৃতীয় বিষয়বস্তুটি কুরআনের এক জায়গায় বেশী স্পষ্টভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَٰلِدِينَ

"এমনকি যখন তারা সেখানে পৌঁছুবে এবং তার দরোজা আগে থেকেই খোলা থাকবে তখন জান্নাতের ব্যবস্থাপকরা তাদেরকে বলবে, 'সালামুন আলাইকুম, শুভ আগমন', চিরকালের জন্য এর মধ্যে প্রবেশ করুন।" (আয্‌ যুমার, ৭৩)

৫৩. সমবয়সী স্ত্রী অর্থ এও হতে পারে যে, তারা পরস্পর সমান বয়সের হবে আবার এও হতে পারে যে, তারা নিজেদের স্বামীদের সমান বয়সের হবে।

৫৪. মূলে غَسَّاق শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আভিধানিকরা এর কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। এর একটি অর্থ হচ্ছে, শরীর থেকে বের হয়ে আসা রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি জাতীয় নোংরা তরল পদার্থ এবং চোখের পানিও এর অন্তরভুক্ত। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, অত্যন্ত ও চরম

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى خَٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَٰجِدِينَ ﴿٧٢﴾ فَسَجَدَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾ إِلَّآ إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٧٤﴾

যখন তোমার রব ফেরেশ্‌তাদেরকে বললো,[৫৯] "আমি মাটি দিয়ে একটি মানুষ তৈরি করবো।[৬০] তারপর যখন আমি তাকে পুরোপুরি তৈরি করে ফেলবো এবং তার মধ্যে নিজের প্রাণ ফুঁকে দেবো[৬১] তখন তোমরা তার সামনে সিজদানত হয়ে যেয়ো।"[৬২] এ হুকুম অনুযায়ী ফেরেশ্‌তারা সবাই সিজদানত হয়ে গেলো, কিন্তু ইবলিস নিজে শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার করলো এবং সে কাফেরদের অন্তরভূক্ত হয়ে গেলো।[৬৩]

ঠাণ্ডা জিনিস। তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, চরম দুর্গন্ধযুক্ত পচা জিনিস। কিন্তু প্রথম অর্থেই এ শব্দটির সাধারণ ব্যবহার হয়, যদিও বাকি দু'টি অর্থও আভিধানিক দিক দিয়ে নির্ভুল।

৫৫. এখানে এমন মু'মিনদের কথা বলা হয়েছে, যাদেরকে এ কাফেররা দুনিয়ায় খারাপ ভাবতো। এর অর্থ হচ্ছে, তারা অবাক হয়ে চারদিকে দেখতে থাকবে। ভাবতে থাকবে, এ জাহান্নামে তো আমরা ও আমাদের নেতারা সবাই আছি কিন্তু দুনিয়ায় আমরা যাদের দুর্নাম গাইতাম এবং আল্লাহ, রসূল ও আখেরাতের কথা বলার কারণে আমাদের মজলিসে যাদেরকে বিদ্রূপ করা হতো তাদের নাম নিশানাও তো এখানে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

৫৬. শুরুতে যে বিষয়বস্তুর ওপর ভাষণ শুরু হয়েছিল এখন বক্তব্য আবার সেদিকে মোড় নিচ্ছে। এ অংশটি পড়ার সময় প্রথম রুকূ'র সাথে তুলনামূলক অধ্যয়নও করতে থাকুন। এভাবে বক্তব্য পুরোপুরি অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

৫৭. ৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছিল, এদের মধ্য থেকেই একজন সতর্ককারীর উত্থান ঘটায় এরা বড়ই বিস্ময় প্রকাশ করছে। এখানে বলা হচ্ছে, এদেরকে বলো, আমার কাজ হচ্ছে কেবলমাত্র তোমাদেরকে সতর্ক করে দেয়া। অর্থাৎ আমি কোন ফৌজদার বা সেনাধ্যক্ষ নই যে, জবরদস্তি তোমাদেরকে ভুল পথ থেকে সরিয়ে সঠিক পথে টেনে আনবো। আমি বুঝাবার ফলে যদি তোমরা না বুঝো তাহলে নিজেদেরই ক্ষতি করবে। বেখবর থাকাটাই যদি তোমাদের কাছে পছন্দনীয় হয়ে থাকে তাহলে নিজেদের গাফিলতির মধ্যে ডুবে থাকো। এভাবে নিজেদের পরিণাম তোমরা নিজেরাই ভোগ করবে।

৫৮. ৫ নম্বর আয়াতে কাফেরদের যে কথা বলা হয়েছে এটি তার জবাব। সেখানে বলা হয়েছে ঃ "এ ব্যক্তি কি সমস্ত খোদার পরিবর্তে একজন খোদা বানিয়েছে? এ তো বড়ই

অদ্ভুত কথা।" এর জবাবে বলা হচ্ছে, তোমরা যতই নাক সিটকাওনা কেন, অবশ্যই এটি একটি সত্য, এর সংবাদ আমি তোমাদের দিচ্ছি এবং তোমাদের নাক সিটকাবার ফলে এ সত্য বদলে যেতে পারে না।

এ জবাবে কেবলমাত্র সত্যের বর্ণনাই নেই বরং তার সত্য হবার প্রমাণও এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে। মুশরিকরা বলতো, অনেক উপাস্যের মধ্যে আল্লাহও একজন। তোমরা সমস্ত উপাস্যদেরকে খতম করে দিয়ে একজনকে মাত্র উপাস্য করে নিলে কেমন করে? এর জবাবে বলা হয়েছে, একমাত্র আল্লাহই প্রকৃত উপাস্য ও মাবুদ। কারণ তিনি সবার ওপর আধিপত্য বিস্তারকারী, আকাশ ও পৃথিবীর মালিক এবং বিশ্ব–জাহানের সমস্ত জিনিস তাঁর মালিকানাধীন। তাঁকে বাদ দিয়ে এ বিশ্ব–জাহানে যেসব সত্তাকে তোমরা মাবুদ বানিয়ে রেখেছো তাদের মধ্যে কোন একটি সত্তাও এমন নেই, যে তাঁর অধীন ও গোলাম নয়। এসব কর্তৃত্বাধীন ও গোলাম সত্তা সেই সর্বময় কর্তৃত্বকারী ও প্রাধান্যবিস্তারকারী সত্তার কর্তৃত্বে শরীক হতে পারে কেমন করে? কোন্ অধিকারে এদেরকে মাবুদ ও উপাস্য গণ্য করা যেতে পারে?

৫৯. ওপরের আয়াতে যে বিরোধের দিকে ইংগিত করা হয়েছে এ হচ্ছে তার বিস্তারিত বিবরণ। এ বিরোধ বলতে আল্লাহর সাথে শয়তানের বিরোধ বুঝানো হয়েছে যেমন সামনের আলোচনা থেকে প্রকাশ হচ্ছে। এ প্রসংগে একথা মনে রাখতে হবে যে, "উর্ধজগত" বলতে ফেরেশ্তাদেরকে বুঝানো হয়েছে এবং আল্লাহর সাথে শয়তানের কথাবার্তা সামনাসামনি হয়নি বরং কোন মধ্যবর্তী ফেরেশ্তার মাধ্যমেই হয়েছে। কাজেই কারো এ ভুল ধারণা হওয়া উচিত নয় যে, আল্লাহও উর্ধজগতের অন্তরভুক্ত ছিলেন। এখানে যে কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছে, তা ইতিপূর্বে নিম্নোক্ত স্থানসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারাহ, ৩৫–৫৩; আল আ'রাফ, ১০–১৫; আল হিজর, ১৭–১৯; বনী ইসরাঈল, ৭১–৮২; আল কাহ্ফ, ৪৬–৪৮ এবং ত্বা–হা, ৯২–১০৬ টীকাসমূহ।

৬০. মূল শব্দ হচ্ছে بشر (বাশারা)। এর আভিধানিক অর্থ "স্থূলদেহ", যার বাইরের অংশ কোন জিনিসে আবৃত নয়। মানুষ সৃষ্টির পর এ শব্দটি বরাবর মানুষের জন্যই ব্যবহৃত হতে থেকেছে। কিন্তু মানুষ সৃষ্টির আগে তার জন্যে 'বাশার' শব্দ ব্যবহার করা এবং তাকে মাটি দিয়ে তৈরি করার পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে এই যে, "আমি মাটির একটি পুতুল বানাতে চাই। তার ডানা ও পালক থাকবে না। অর্থাৎ তার ত্বক অন্যান্য প্রাণীর মতো উল, পশম, লোম ও পালকে ঢাকা থাকবে না।"

৬১. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল হিজর, ১৭–১৯ এবং আস সিজদাহ, ১৬ টীকা।

৬২. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারাহ, ৪৫ এবং আল আ'রাফ, ১০ টীকা।

৬৩. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারাহ, ৪৭ এবং আল কাহ্ফ, ৪৮ টীকা।

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٧٥﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿٧٦﴾ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٨﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٧٩﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿٨٠﴾ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾

রব বললেন, "হে ইবলিস! আমি আমার দু'হাত দিয়ে যাকে তৈরি করেছি তাকে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছে?[৬৪] তুমি কি বড়াই করছো, না তুমি কিছু উচ্চ মর্যাদার অধিকারী?" সে জবাব দিল, "আমি তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো আগুন থেকে এবং তাকে মাটি থেকে।" বললেন, "ঠিক আছে, তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও,[৬৫] তুমি বিতাড়িত[৬৬] এবং প্রতিদান দিবস পর্যন্ত তোমার প্রতি আমার লানত।"[৬৭] সে বললো, "হে আমার রব! একথাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে এদেরকে যখন পুনরায় উঠানো হবে সে সময় পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও।" বললেন, ঠিক আছে, তোমাকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হলো যার সময় আমি জানি।"

৬৪. মানুষ সৃষ্টির মর্যাদা প্রমাণ করার জন্য এ শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। বাদশাহ তাঁর চাকর বাকরদের দিয়ে কোন কাজ করালে তাতে সেটি যে একটি মামুলি ও সাধারণ পর্যায়ের কাজ ছিল তা প্রমাণ হয়ে যায়। অন্যদিকে বাদশাহ যদি নিজেই এবং নিজ হাতে কোন কাজ করেন তাহলে তা প্রমাণ করে যে, সেটি একটি অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠ কাজ ছিল। কাজেই আল্লাহর উক্তির অর্থ হচ্ছে এই যে, যাকে আমি নিজে কোন প্রকার মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি তৈরি করেছি তার সামনে নত হতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছে?

"দু'হাত" শব্দের মাধ্যমে সম্ভবত এ দিকে ইংগিত করাই উদ্দেশ্য যে, এ নতুন সৃষ্টিটির মধ্যে আল্লাহর সৃষ্টি কুশলতার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দিক পাওয়া যায়। এক, তাকে প্রাণীর দেহাবয়ব দান করা হয়েছে। এর ফলে সে প্রাণীকূলের একটি জাতিতে পরিণত হয়েছে। দুই, তার মধ্যে এমন প্রাণ সঞ্চার করে দেয়া হয়েছে যার ফলে সে তার নিজের যাবতীয় গুণাবলীর ক্ষেত্রে পৃথিবীর সৃষ্টজীবের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করেছে।

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ﴿٨٤﴾ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٦﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿٨٨﴾

সে বললো, "তোমার ইজ্জতের কসম, আমি এদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করবোই, তবে একমাত্র যাদেরকে তুমি একনিষ্ঠ করে নিয়েছো তাদেরকে ছাড়া।"[৬৮] বললেন, "তাহলে এটিই সত্য এবং আমি সত্যই বলে থাকি যে, আমি তোমাকে[৬৯] এবং এসব লোকদের মধ্য থেকে যারা তোমার আনুগত্য করবে তাদের সবাইকে দিয়ে জাহান্নাম ভরে দেবো।"[৭০]

(হে নবী!) এদেরকে বলো, আমি এ প্রচার কাজের বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাইছি না[৭১] এবং আমি বানোয়াট লোকদের একজনও নই।[৭২] এ তো একটি উপদেশ সমস্ত পৃথিবীবাসীর জন্য এবং সামান্য সময় অতিবাহিত হবার পরই এ সম্পর্কে তোমরা নিজেরাই জানতে পারবে।[৭৩]

৬৫. অর্থাৎ সেখান থেকে যেখানে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, যেখানে আদমের সামনে ফেরেশ্‌তাদের সিজদা করার হুকুম দেয়া হয়েছিল এবং যেখানে ইবলিস মহান আল্লাহর নাফরমানি করেছিল।

৬৬. মূলে "রাজীম" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে "নিক্ষিপ্ত" বা "যাকে মারা হয়েছে।" অন্যদিকে প্রচলিত বাগধারা অনুযায়ী এ শব্দটি এমন ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে যাকে মর্যাদার আসন থেকে নামিয়ে দেয়া হয়েছে এবং লাঞ্ছিত ও হেয় করে রাখা হয়েছে। সূরা আ'রাফে এ বিষয়বস্তুটিই এভাবে বলা হয়েছে ঃ

فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ

"কাজেই তুই বের হয়ে যা, তুই লাঞ্ছিত সত্তাদের একজন।"

৬৭. এর অর্থ এ নয় যে, শেষ বিচারের দিনের পরে তার ওপর আর লানত পড়বে না। বরং এর অর্থ হচ্ছে, শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত তো সে এ নাফরমানির কারণে অভিসম্পাত পেতে থাকবে এবং শেষ বিচারের পরে সে আদমের সৃষ্টি থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যত অপকর্ম করেছে তার শাস্তি ভোগ করবে।

৬৮. এর অর্থ এ নয় যে, "আমি তোমার নির্বাচিত বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবো না।" বরং এর অর্থ হচ্ছে, "তোমার নির্বাচিত বান্দাদের ওপর আমার জারিজুরি খাটবে না।"

৬৯. "তোমাকে দিয়ে" শব্দের মাধ্যমে কেবলমাত্র ব্যক্তি ইবলিসকেই সম্বোধন করা হয়নি বরং সমগ্র জিন জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ ইবলিস ও তার সমগ্র শয়তান দল যারা তার সাথে মিলে মানুষ জাতিকে গোমরাহ করার কাজে লিপ্ত থাকবে।

৭০. এ পুরো কাহিনীটি শুনানো হয় কুরাইশ সরদারদের একটি কথার জবাবে। তারা বলে :

أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا

"আমাদের মধ্যে কি এ একজনই লোক রয়ে গিয়েছিল যার ওপর যিক্‌র নাযিল করা হয়েছে?"

৯ ও ১০ নম্বর আয়াতে যা বলা হয়েছে তাই ছিল এর জবাব। সেখানে বলা হয়েছে, "তোমরা কি আল্লাহর রহমতের ভাণ্ডারের মালিক, তোমরা কি আকাশ ও পৃথিবীর বাদশাহ এবং কাকে আল্লাহর নবী করা হবে ও কাকে করা হবে না এ ফায়সালা করা কি তোমাদের কাজ?" দ্বিতীয় জবাব এবং এর মধ্যে কুরাইশ সরদারদেরকে যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোকাবিলায় তোমাদের হিংসা ও শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার, আদম আলাইহিস সালামের মোকাবিলায় ইবলিসের হিংসা ও অহংকারের সাথে মিলে যায়। ইবলিসও আল্লাহ যাকে চান তাকে খলিফা বা প্রতিনিধি করবেন তাঁর এ অধিকার মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল। সে আদমের সামনে মাথা নত করার হুকুম মানেনি এবং তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করার হুকুম মানছো না। তার সাথে তোমাদের এ সামঞ্জস্য কেবলমাত্র এখানেই শেষ হয়ে যাবে না বরং তোমাদের পরিণামও আবার তাই হবে যা তার জন্য নির্ধারিত হয়ে গেছে অর্থাৎ দুনিয়ায় আল্লাহর লানত এবং আখেরাতে জাহান্নামের আগুন।

এ সংগে এ কাহিনীর আওতায় আরো দু'টি কথাও বুঝানো হয়েছে। এক, এ দুনিয়ায় যে মানুষই আল্লাহর নাফরমানি করছে সে আসলে তার সে চিরন্তন শত্রুর ফাঁদে আটকে যাচ্ছে, যে সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই মানব জাতিকে ফুসলিয়ে কুপথে পরিচালনা করার স্থির সিদ্ধান্ত করে রেখেছে। দুই, যে ব্যক্তি অহংকারের কারণে আল্লাহর নাফরমানি করে এবং তারপর নিজের এ নাফরমানি করার নীতির ওপর জিদ ধরে থাকে, আল্লাহর দৃষ্টিতে সে চরম ঘৃণিত। আল্লাহর কাছে এ ধরনের মানুষের কোন ক্ষমা নেই।

৭১. অর্থাৎ আমি একজন নিস্বার্থ ব্যক্তি। নিজের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থে আমি এসব কথা প্রচার করছি না।

৭২. অর্থাৎ আমি তাদের অন্তরভুক্ত নই যারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য মিথ্যা দাবী নিয়ে ওঠে এবং তারপর প্রকৃতপক্ষে তারা যা নয় তাই হয়ে বসে। একথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ দিয়ে শুধুমাত্র মক্কার কাফেরদেরকে জানিয়ে দেবার জন্য বলা হয়নি বরং কাফেরদের মাঝে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের যে চল্লিশটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল এর পেছনে তার সবটাই সাক্ষী হিসেবে বিদ্যমান

রয়েছে। মক্কার আবালবৃদ্ধবনিতা একথা জানতো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন বানোয়াট নবী নন। সমগ্র জাতির মধ্যে কোন এক ব্যক্তিও কখনো তাঁর মুখ থেকে এমন কোন কথা শোনেনি যা থেকে এ সন্দেহ করার অবকাশ হয় যে, তিনি কিছু একটা হতে চান এবং তিনি নিজেকে গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তা করছেন।

৭৩. অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে তারা কয়েক বছরের মধ্যে স্বচক্ষে দেখে নেবে আমি যা বলছি তা সঠিক প্রমাণিত হবেই। আর যারা মরে যাবে তারা মৃত্যুর দুয়ার অতিক্রম করার পরপরই জানতে পারবে, আমি যাকিছু বলছি তা–ই প্রকৃত সত্য।